CHRI 2016

সমতার কঠিন পথে

বাংলাদেশের নারী পুলিশ

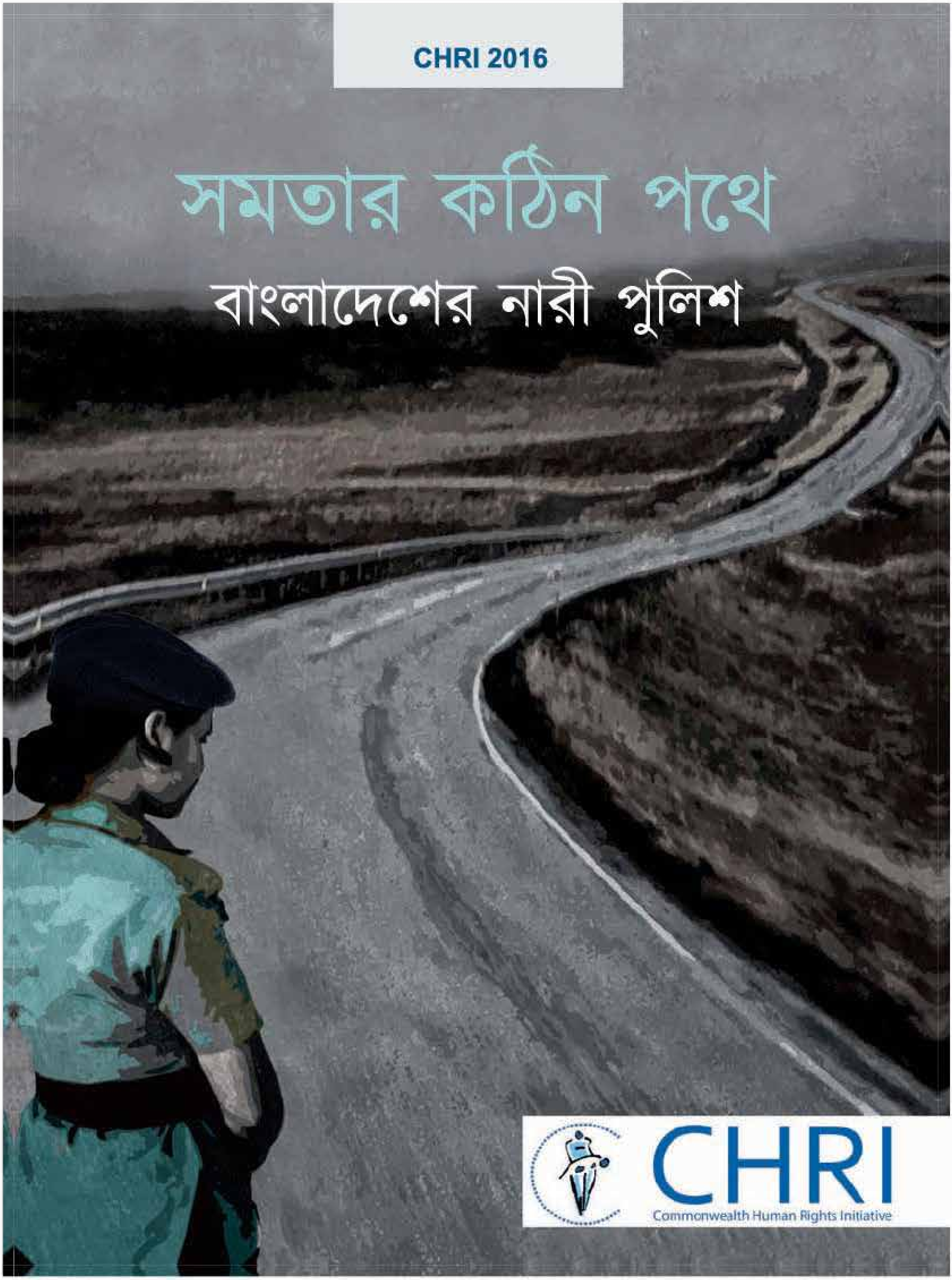

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) হলো একটি স্বাধীন, দল নিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন। কমনওয়েলথভুক্ত কয়েকটি পেশাজীবী সংস্থার* যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে সিএইচআরআই-এর প্রতিষ্ঠা হয়।

উল্লিখিত সংস্থাগুলোর তখন এই উপলব্ধি হয়েছিল যে, যদিও কমনওয়েলথ তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মানবাধিকার উন্নয়নের কাজের জন্য কিছু একক মূল্যবোধ ও আইনগত নীতিমালা প্রদান করে থাকে এবং তার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন ফোরাম কাজ করে, কিন্তু কমনওয়েলথ এর অভ্যন্তরে মানবাধিকার বিষয়ে কম মনোযোগ দেওয়া হয়।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সনদ সম্পর্কে সচেতনতা ও এর প্রতি আর্থসামাজিক বিশ্বস্ততা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়াও 'হারারে নীতিমালা'সহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মানবাধিকার নীতি-ঘোষণা-কাঠামোর বাস্তবায়ন ও অনুসরণ উদ্যোগ শক্তিশালী করা সিএইচআরআই এর কাজের লক্ষ্য।

এসব লক্ষ্য অর্জনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে সিএইচআরআই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন রিপোর্ট ও 'পেরিওডিক রিভিউ' প্রকাশ করছে। মানবাধিকারের বিপন্নতা থেকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সমাজ জীবনকে রক্ষা করতে উদ্যোগ গ্রহণ ও পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সিএইচআরআই কমনওয়েলথ সচিবালয়, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাজ করে।

সিএইচআরআই-এর কর্মসূচিগুলোর মাঝে রয়েছে মানবাধিকার বিষয়ক জনশিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে সংলাপের আয়োজন, তুলনামূলক গবেষণা, প্রচারণা ও পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে তোলা। লক্ষ্য অর্জনে সিএইচআরআই বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার মাঝে মূলত অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ে থাকে।

সিএইচআরআই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলো জাতীয় পর্যায়ে কাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কেরও সদস্য হতে পারে। পেশাজীবীদের এসব সংস্থা তাদের কাজে মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পরিসরে অনুরূপ মানদণ্ড অনুসরণের তাগিদ তৈরি করে থাকে। মানবাধিকার বিষয়ক তথ্যাদি, অনুসরণীয় মানদণ্ড প্রচারের ক্ষেত্রেও তারাই প্রধান মাধ্যম। এসব গ্রুপ মানবাধিকার ইস্যুগুলোকে প্রচারণায় নিয়ে আসা ও লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগায় এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে লবি করে থাকে।

সিএইচআরআই-এর প্রধান দপ্তর ভারতের দিল্লিতে। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের লন্ডন ও ঘানার আক্রাতেও এর কার্যালয় রয়েছে।

আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটি: ইয়াশপাল ঘাই-চেয়ারপার্সন। সদস্য: অ্যালিসন ডাক্সবারি, ক্লেয়ার ডোবে, ওয়াযাহাত হাবিবুল্লাহ, ভিভেক মারু, এডুয়ার্ড মরটিমের, সাম ওকুদজেটো এবং মায়া দারুওয়ালা।

নির্বাহী পরিষদ (ভারত): ওয়াযাহাত হাবিবুল্লাহ-চেয়ারপারসন; সদস্যমণ্ডলী: বি কে চন্দ্রশেখর, নীতিন দেশাই, সঞ্জয় হাজারিকা, কমল কুমার, পুনম মুত্তেরেজা, রুমা পাল, জাকব পুন্নুস, এ পি শাহ এবং মায়া দারুওয়ালা।

নির্বাহী পরিষদ (ঘানা): সাম ওকুদজেটো- চেয়ারপারসন; সদস্যমণ্ডলী: আকোতো আমপাও, ইয়াশপাল ঘাই, ওয়াযাহাত হাবিবুল্লাহ, নেভিলি লিন্টন, কফি কোয়াসিগা, জুলিয়েট টুয়াক্লুলি এবং মায়া দারুওয়ালা।

নির্বাহী পরিষদ (ব্রিটেন): চেয়ারপার্সন, সদস্যমণ্ডলী: মীনাক্ষী ধর, জোয়ানা এওয়ার্ট জেমস, ফ্রান্সেস হ্যারিসন, সাদাকাত কাদরী, শাশি নাথান, ক্যাথরিন ও'বার্নে, রিতা পায়নে, মাইকেল স্টোন, রিচার্ড বোন।

*কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ লিগ্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন।

আই এস বি এনঃ ৯৭৮-৯৩-৮১২৪১-৩৪-৯

© কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, ২০১৬। এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু, যথাযথ স্বীকারোক্তি সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)

সিএইচআরআই সদর দপ্তর, নতুন দিল্লী
৫৫ এ, তৃতীয় তলা, সিদ্ধার্থ চেম্বার-১
কালু সরাই, নতুন দিল্লী ১১০ ০১৬
ভারত
ফোন: +৯১ ১১ ৪৩১৮ ০২০০
ফ্যাক্স: +৯১ ১১ ২৬৮৬ ৪৬৮৮
ই-মেইল: info@humanrightsinitiative.org

সিএইচআরআই লন্ডন
রুম নং ২১৯
স্কুল অফ অ্যাডভান্স স্টাডি
সাউথ ব্লক, সিনেট হাউজ
ম্যালেট স্ট্রিট, লন্ডন WC1E7HU
যুক্তরাজ্য
ফোন: +৪৪ (০) ২০৭ ৬৬৪ ৪৮৬০
ফ্যাক্স: +৪৪(০) ২০৭ ৮৬২ ৮৮২০
ই-মেইল: chri.admin@sas.ac.uk

সিএইচআরআই, আক্রা
হাউজ নং ৯, সামোরা
মাচেল স্ট্রিট অ্যাসাইলাম ডাউন,
বেভারলি হিল হোটেল এর বিপরীতে
ট্রাস্ট টাওয়ার এর নিকট, আক্রা
ঘানা
ফোন/ফ্যাক্স: +২৩৩ ৩০২ ৯৭১১৭০
ই-মেইল: chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

সমতার কঠিন পথে

বাংলাদেশের নারী পুলিশ

গবেষক এবং লেখক
অদিতি দত্ত

সম্পাদক
দেবিকা প্রসাদ ও শেরিল ব্লেক

বাংলা অনুবাদ
সৌভিক দাস তমাল

এই প্রতিবেদনটির অনুবাদ ইউরোপিয়ান
উনিয়নের সহায়তায় করা হয়েছে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ iv

এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য এবং প্রস্তুত পদ্ধতি 1

১ এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য 1

২ প্রস্তুত পদ্ধতি 1

প্রেক্ষাপট 4

১ পুলিশ বিভাগ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য 4

২ পুলিশ বিভাগে নারীদের প্রবেশের ইতিহাস 5

৩ বাংলাদেশ পুলিশে নারীর প্রতিনিধিত্ব 7

জরিপের ফলাফল 11

১ ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা এবং পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি 11

২ নারীদের সাধারণ কর্ম অভিজ্ঞতা এবং সন্তুষ্টি 16

৩ কর্মজীবন এবং পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের চ্যালেঞ্জ 21

৪ সুযোগ-সুবিধা এবং সেবা সমূহ 27

৫ প্রশিক্ষণ এবং পেশাদার উন্নয়ন 32

৬ নারী পুলিশ এবং নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা/অপরাধ 37

৭ সরাসরি পক্ষপাতিত্ব বা হয়রানি বিষয়ে নারীদের অভিজ্ঞতা 41

৮ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি 44

উপসংহার এবং সুপারিশ 49

পরিশিষ্ট 54

১ নারী পুলিশ কনস্টেবলদের জন্য জরিপের প্রশ্নমালা 54

২ নারী পুলিশ ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরদের জন্য জরিপের প্রশ্নমালা 57

৩ নারী পুলিশ ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য জরিপের প্রশ্নমালা 61

৪ বাংলাদেশ পুলিশের পদমর্যাদা সমূহ 63

৫ বাংলাদেশ পুলিশের কাঠামো 64

মুখবন্ধ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস (সিএইচআরআই) গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত, পূর্ব আফ্রিকা, এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়াতে উন্নত পুলিশ ব্যবস্থার জন্য কাজ করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়াতে পুলিশ ব্যবস্থা সংক্রান্ত সাধারণ যেসকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হয় সেই সম্পর্কে পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার লক্ষ্যে সিএইচআরআই বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ, সম্মেলন ও আঞ্চলিক আলোচনার আয়োজন করেছে। এভাবে সিএইচআরআই দক্ষিণ এশিয়াতে উন্নত পুলিশ ব্যবস্থার চাহিদা সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়াসহ কমনওয়েলথ দেশসমূহের পুলিশ ব্যবস্থায় ভাল-মন্দ মিলিয়ে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে, এখানে সুবিবেচনা সম্পন্ন পুলিশ ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে অনেক উত্তম চর্চা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে। অপরদিকে অনেকগুলি রাষ্ট্র এখনও ঔপনিবেশিক আমলের পুরাতন পুলিশ ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছে, যা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধের সাথে বেমানান। এই ধরনের পুলিশ ব্যবস্থার একটি নেতিবাচক দিক হলো, পুলিশ বিভাগের সংস্থাগুলোতে নারী-পুরুষের ভারসাম্যহীনতা, যা একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিশেষত বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থায় নারীদের পরিস্থিতি বিষয়ক "সমতার পথে: বাংলাদেশের নারী পুলিশ" শীর্ষক প্রতিবেদনটি এই বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যবিষয়ক মূল্যবোধের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমতার অভাব চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, নারী পুলিশদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ পুলিশ এবং সুশীল সমাজকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেবে এবং পুলিশ ব্যবস্থায় বিরাজমান নারী-পুরুষের সমতা উন্নয়নের জন্য চলমান আলোচনার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সিএইচআরআই বিশ্বাস করে যে আধুনিক যুগের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে পুলিশ ব্যবস্থায় বিস্তর সংস্কার সাধনের প্রথম ধাপ হবে পুলিশ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ এবং সমতা সাধন করা।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকার এবং জরিপ পরিচালনা করার অনুমতি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রতি সিএইচআরআই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই মিলি বিশ্বাস এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন) কে, যারা এই গবেষণার যথার্থতা নিশ্চিত করতে অনেক সহায়তা করেছেন। গবেষণার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রদানের জন্য বিপিডব্লিউএন এর সহ সভাপতি শাহিমা বেগমকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই গবেষণা চলাকালীন নানা ধরনের সহায়তা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট এর প্রতি আমরা ঋণী।

পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম এর ফওজিয়া খোন্দকারকে তার মূল্যবান উপদেশ এবং দিক-নির্দেশনার জন্য সিএইচআরআই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

মায়া দারুওয়ালা
পরিচালক, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস (সিএইচআরআই)

এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য এবং প্রস্তুত পদ্ধতি

১। এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য

এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থায় নারীদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে। নারী-পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কার্যকরী এবং প্রকৃত নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগে অবদান রাখে। এই প্রতিবেদন পুলিশ ব্যবস্থায় উপযোগিতার ভিত্তিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি-করণকে সমর্থন করে, কারণ আজকের পুলিশ ব্যবস্থার অধিকাংশ কার্য নারী-পুরুষ উভয়েই সম্পাদন করতে পারে। পুলিশের কাজ শুধুমাত্র পুরুষদের কাজ, প্রচলিত এই ধারণার সমর্থনে প্রায় কোন যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি এই প্রতিবেদনের অন্যতম মূল বক্তব্যের একটি।

বিশেষত বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে রচিত এই প্রতিবেদনটি দক্ষিণ এশিয়ায় নারী পুলিশদের পরিস্থিতি বিষয়ক কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিসিয়েটিভস (সিএইচআরআই) এর আঞ্চলিক গবেষণার একটি অংশ এবং সেই অগ্রগামী গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।[1] বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্কের[2] অংশিদারিত্বে সিএইচআরআই এই গবেষণা পরিচালনার জন্য দুইশত এরও অধিক বিভিন্ন পদ মর্যাদার নারী পুলিশের সাথে কাজ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের ওপর এই অনবদ্য গবেষণার জন্য উৎকৃষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পদ মর্যাদার নারী-পুলিশদের সাথে একটি জরিপ এবং একটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফডিজি) পরিচালনা করা হয়েছে এবং এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, পুলিশ বিভাগে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সকল আইনগত এবং নীতিগত আলোচনায় একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করা, যেখানে নারীদের নিজেদের অভিজ্ঞতা, ধারণা, মতামত এবং অগ্রাধিকার সমূহ বিবেচনা করা হবে। একই সাথে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত চলমান পদক্ষেপ সমূহের ওপরেও আমরা আলোকপাত করি বহুদিন যাবত বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সমূহ সনাক্ত করি এবং বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদান করে থাকি।

২। প্রস্তুত পদ্ধতি

২০১৩ সালের শেষের দিকে সিএইচআরআই পুলিশ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর থেকে অনুমতি গ্রহণ করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট, এই তিনটি পুলিশ রেঞ্জ এর কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার নারীদের সাথে সাক্ষাৎকার, জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন পরিচালনা করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হয়। বিশেষত আমরা, জুনিয়র এবং মধ্যম পদমর্যাদার[3] মধ্যে কনস্টেবল, সহকারী সাব-ইনস্পেক্টর এবং ইনস্পেক্টরদের সাথে কথা বলেছি এবং কিছু সংখ্যক সিনিয়র নারী কর্মকর্তাদের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। আমাদের সেশন সমূহে নারী পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার

---

1. "সমতার কঠিন পথেঃ দক্ষিণ এশিয়ার নারী পুলিশ" শীর্ষক সিএইচআরআই এর আঞ্চলিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং মালদ্বীপ এর নারী পুলিশদের পরিস্থিতি নিরূপণ করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার নারীপুলিশরা মাঠপর্যায়ে যেসকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন এই প্রথম তার একটি পদ্ধতিগত মূল্যায়ন করা হলো এবং এই প্রতিবেদনে সেই মূল্যায়ন এবং পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরে জেন্ডার সমতা আরো সংহত করা জন্য কিছু সুপারিশমালা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এটি ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশ করা হয়। নিচের লিঙ্কটিতে উক্ত প্রতিবেদনটি প্রাপ্তিসাধ্যঃ http://humanrightsinitiative.org/tenders/CHRI_Women%20Police%20in%20South%20 Asia_2015.pdf
2. বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্ক ২০০৮ সালে এর যাত্রা শুরু করে। এটি সকল পদমর্যাদার নারী পুলিশ সদস্যদের একটি ফোরাম এবং এট বসাংলাদেশ পুলিশে নারী ভূমিকার অগ্রগতি সাধনের জন্য একটি নিবেদিত নেটওয়ার্ক। এই প্রতিবেদনে এই নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য প্রদান করা হয়েছে। আরো বিস্তারিত জানতে নিচের লিঙ্ক টি ভিজিট করুনঃ http://www.bpwn.org.bd/.
3. জুনিয়র এবং মধ্য পর্যায়ের এসকল পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের সাথে আমাদেরকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে আমাদের জরিপটি পরিচালিত হওয়ার সময় সার্জেন্ট পদের নারীদেরকে নিয়োগ করা হত না। সেই সময় এই পদমর্যাদায় কোনও নারী পুলিশ ছিলেন না।

মাধ্যমে বাংলাদেশ মহিলা পুলিশ নেটওয়ার্ক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছে।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহও অবলম্বন করা হয়েছে:

পুস্তক পর্যালোচনা:

এই পর্যায়ে, পুলিশ বিভাগের অবকাঠামো, পদমর্যাদা, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পদোন্নতি; সংবিধান এবং বিভিন্ন আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী, বিশেষত নারীদের অধিকার এবং সমতা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ; সংরক্ষণ নীতিমালা; নারী পুলিশ বিষয়ক বিধিমালা মূল্যায়ন করতে পুলিশ বিভাগের ম্যানুয়াল ও প্রবিধান সমূহ; প্রাসঙ্গিক যেকোনো আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন; এবং গণমাধ্যমের প্রবন্ধ সমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। নারীদের সংখ্যা বিষয়ক উন্মুক্ত কোনও পরিসংখ্যান প্রাপ্তিসাধ্য না থাকায়, বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে পুলিশ বিভাগে নারীদের সংখ্যা বিষয়ক সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রদান করে।

জরিপ:

গবেষণার জন্য শনাক্তকৃত বিষয়সমূহের ওপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছিল যা এই জরিপে ব্যবহার করা হয়। উন্মুক্ত এবং নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্বলিত এই প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য ছিল নারী পুলিশদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান-গত চিত্র তুলে ধরা। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে সিএইচআরআই ফোকাস গ্রুপ সেশন এবং জরিপ পরিচালনার জন্য বিপিডব্লিউএন এর সাথে অংশিদারিত্বের স্থাপন করে। বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের ৭[4] টি প্রশাসনিক রেঞ্জ এর মধ্যে তিনটি তে এই সেশন সমূহ পরিচালিত হয়, যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট[5]। খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর রেঞ্জেরও কিছু সংখ্যক সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন।

মুখোমুখি সাক্ষাৎকার:

এসকল সেশনের সাথে সাথে, বৃহত্তর নীতিগত বিষয়সমূহ এবং তাদের চাকুরীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারী পুলিশদের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে তার বিশদ বিবরণ জানার জন্য, সিএইচআরআই ১২ জন জ্যেষ্ঠ নারী পুলিশ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার[6] গ্রহণ করে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন:

পুলিশ সদস্যদের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং জরিপ দুইটি ভাগে সম্পাদিত হয়। ইন্সপেক্টর / সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই)/ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইন্সপেক্টরদের (এএসআই) সাথে একটি ভাগে[7] এবং কনস্টেবলদের সাথে আর একটি ভাগে।[8] এই পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের মধ্যে কাজ এবং পেশাগত দায়িত্বের পার্থক্য থাকায় উল্লিখিত শ্রেণী বিভাজনটি করা হয়। এই দুইটি ভাগের জন্য জরিপের প্রশ্নমালায় কিঞ্চিৎ রদবদল করা হয়।

নিম্নোক্ত ছকে বিভিন্ন রেঞ্জ থেকে অংশগহণকারীদের সর্বমোট সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে:[9, 10, 11]

---

4. সিএইচআরআই যখন এই জরিপটি পরিচালনা করে তখন বাংলাদেশ সাতটি প্রশাসনিক বিভাগ ছিল, যার ভেতরে প্রতিটি পুলিশ ইউনিটের অন্তত একটি কার্যকর আছে (এছাড়াও অন্যান্য অ-ভৌগোলিক ইউনিটও রয়েছে, যেমন রেলওয়ে পুলিশ)। অনুগ্রহপূর্বক নিচের লিঙ্কটি দেখুনঃ http://www.police.gov.bd/BdpoliceOrgr.php?id=287. সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে বর্তমানে আটটি প্রশাসনিক ডিভিশন রয়েছে, এবং আরো কিছু ডিভিশন সৃষ্টি করার পরিকল্পনা রয়েছে।
5. চট্টগ্রামের উত্তরদাতারা উক্ত রেঞ্জের চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ সহ ১১টি জেলার সবগুলোকেই প্রতিনিধিত্ব করে। সিলেটে চারটি জেলা এবং সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ অংশগ্রহণ করে এবং ঢাকাতে ১৭ টি জেলার মধ্যে ৭টি জেলা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা আসেন। আবার রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের আওতায় একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে কাজ করে। বিপিডব্লিউএন উভয় গ্রুপেরই সদস্যদেরকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানায়, যাতে করে আমরা নারী পুলিশদের অভিজ্ঞতার একটি সার্বিক চিত্র জানতে পারি।
6. সাক্ষাৎকার সমূহ বাংলাতে পরিচালনা করা হয়।
7. ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরদের প্রশ্নমালাতে ৩২ টি প্রশ্ন ছিল। এর মধ্যে ২৮ টি সুনির্দিষ্ট এবং ৪ টি ছিল উন্মুক্ত।
8. কনস্টেবলদের প্রশ্নমালাতে ৩১ টি প্রশ্ন ছিল। এর মধ্যে ২৭ টি সুনির্দিষ্ট এবং ৪ টি ছিল উন্মুক্ত।
9. সর্বমোট ৭৩ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন ইনস্পেক্টর , ৩৭ জন ছিলেন এসআই, এবং ৩০ জন ছিলেন এএসআই।
10. চট্টগ্রামের কনস্টেবলদের মধ্যে আটজন উত্তরদাতা দুটি করে উত্তরপত্র জমা দেন, হয়তো তাদের প্রকৃত উত্তর সমূহ সংশোধন করার জন্য। উত্তরদাতা আসলে কোন উত্তরটি জমা দিতে চেয়েছিলেন সেটি যেহেতু আমরা নির্ধারণ করতে পারিনি, সেহেতু এই আটজনের উত্তর আমাদের বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেয়া হয়।
11. নিচে পরিবেশিত তথ্য সমূহের ক্ষেত্রে, কিছু প্রশ্নের উত্তরদাতার সর্বমোট সংখ্যা এখানে পরিবেশিত সর্বমোট সংখ্যার চেয়ে কম হবে। কারণ, যেকোন শুন্য উত্তর ফলাফলের হিসেব থেকে বাদ দেয়া হয় এবং শুধুমাত্র পূর্ণকৃত উত্তর সমূহ থেকে শতাংশ সমূহ নির্ধারণ করা হয়। নিচের আলোচনায় বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে। তবে, শূন্য উত্তরের সংখ্যা খুব কম।

পদমর্যাদা	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	মোট
ইনস্পেক্টর / সাব- ইনস্পেক্টর (এসআই)/ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেক্টর (এএসআই)	২৩	২৫	২৫	৭৩
কনস্টেবল	৬৫	৩৩	৫৬	১৫৪
মোট উত্তরদাতা	৮৮	৫৮	৮১	২২৭

এই প্রতিবেদনে সকল উত্তরদাতার নাম গোপন রাখা হয়। যেকোনো জরিপের মতো এই জরিপটিও কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছে যা শুরুতেই জানিয়ে রাখা দরকার। স্থান সংকুলানের অভাবে, একটি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর একটি সেশনের অংশ হিসেবে এই জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনটি পরিচালনা করতে হয়েছিল।

দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পুলিশ বিভাগে বিদ্যমান কঠোর অন্তর্গত ক্রম শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) এর কারণে জুনিয়র কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সিনিয়র কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তাদের মতামত জ্ঞাপন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। যদিও আলোচনা এবং জরিপ সভাকক্ষের দুটি ভিন্ন প্রান্তে পরিচালনা করার চেষ্টা করা হয়েছিলো,[12] জুনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে জরিপ চলাকালীন অনেক সিনিয়র নারী পুলিশ কর্মকর্তা সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে উত্তরদাতাদের খোলামেলা এবং মানসম্পন্ন ও স্বচ্ছ উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। এছাড়াও চট্টগ্রামে, জরিপ পরিচালনার পূর্বে বিডব্লিউপিএন একটি কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে জরিপে আলোচ্য অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উত্তরদাতাদের মতামতের ওপর এর প্রভাব পড়ে থাকতে পারে।

তারপরও আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশের নারী পুলিশদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কের সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে আর কোন জরিপ পরিচালিত হয়নি। তাই এই প্রতিবেদনের পরিবেশিত তথ্য বাংলাদেশের নারী পুলিশদের প্রত্যক্ষ লিঙ্গ বৈষম্য, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক পরবর্তী গবেষণা, পদক্ষেপ এবং সুপারিশসমূহের ভিত্তি হিসেবে উপযোগী হবে।

জনতাত্ত্বিক চিত্র: বয়স এবং বৈবাহিক অবস্থা

জরিপে প্রত্যেক উত্তরদাতা সম্পর্কে কিছু মৌলিক জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিলো। বয়সের দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ নারী কনস্টেবলের বয়স ২০ এর কোঠায়। ১৫৪ জন কনস্টেবলের মধ্যে ১৪৮ জনের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে; চারজন ছিলেন ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী এবং দুইজন ছিলেন ৫১ থেকে ৬০ বছর বয়সী। এএসআইদের মধ্যে চারজন ছিলেন ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী, ২৩ জন ছিলেন ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, একজন ছিলেন ৪১-৫০ বছর বয়সী এবং একজন ৫১-৬০ বছর বয়সী। একজন উত্তরদাতা এই অংশটি খালি রেখেছেন।

এসআইদের মধ্যে ২২ জনের বয়স ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, ১০ জনের বয়স ৪১-৫০ বছরের মধ্যে, তিনজন ৫১-৬০ বছর বয়সী, একজন নারী ছিলেন ষাটোর্ধ্ব এবং একজন উত্তরদাতা এই অংশটি খালি রেখেছেন। ইন্সপেক্টরদের চারজনের বয়স ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে এবং অন্য একজন ছিলেন ৪১-৫০ বছর বয়সী। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে নারীদের পেশাগত জীবনে বিয়ে একটি বিশাল প্রভাব ফেলে। কর্মজীবী নারীরা তাদের কর্মজীবনে এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে/কর্মক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছেন তা জানার লক্ষ্যে পরিচালিত কোনও গবেষণার জন্য কর্মজীবী নারীদের বৈবাহিক অবস্থা জানা গুরুত্বপূর্ণ। কনস্টেবলরা সাধারণত অনেক কম বয়সী হয়ে থাকে অন্যদের তুলনায়। দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে অধিকাংশ (১১৩) নারীই অবিবাহিত। ৩৮ জন বিবাহিত। এএসআই শ্রেণীর ২৯ জন বিবাহিত এবং একজন অবিবাহিত। এসআইদের ২৯ জনই বিবাহিত এবং ইন্সপেক্টরদের পাঁচজন বিবাহিত এবং একজন অবিবাহিত।

12. চট্টগ্রামে সিনিয়ররা তাদের জুনিয়র সহকর্মীদেরকে স্বাধীনভাবে এবং সৎভাবে তাদের ভাবনা শেয়ার করতে উৎসাহিত করেন।

প্রেক্ষাপট

১। পুলিশ বিভাগ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য

বাংলাদেশ পুলিশ একটি কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এটি ১৯৭১ সালে একটি জাতীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যার সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৬,৮৯,৫৭,৭৪৫ জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বমোট জনশক্তি ১,৫৫,৮৯১ জন।[13]

কাঠামোগতভাবে বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত, যেমন আটটি রেঞ্জ পুলিশ[14], ছয়টি মেট্রোপলিটন পুলিশ[15], স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, ব্যাটেলিয়ন, রেলওয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, হাইওয়ে, পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, টেলিকম এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, টুরিস্ট পুলিশ, স্পেশাল সিকিউরিটি, প্রটেকশন ব্যাটেলিয়ন এবং নেভাল পুলিশ।

পদমর্যাদার কাঠামোতে ১৪টি পদ রয়েছে, ক্রমানুসারে কনস্টেবল, নায়েক, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেক্টর, সার্জেন্ট, সাব- ইনস্পেক্টর, ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেনডেন্ট, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেনডেন্ট, অ্যাডিশনাল সুপারিটেনডেন্ট, সুপারিটেনডেন্ট, অ্যাডিশনাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, অ্যাডিশনাল ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং অ্যাডিশনাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল।

বাংলাদেশ পুলিশের নিয়োগ চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এএসপি), সাব-ইনস্পেক্টর, সার্জেন্ট এবং কনস্টেবল[16]। কনস্টেবল ছাড়া অন্য সকল পদের জন্য ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি প্রয়োজন হয়[17]।

১) বহিরাগত প্রার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ পদ হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ; এটি অফিসার ক্যাডার এর সর্বনিম্ন পদ। এএসপি পদসমূহের দুই-তৃতীয়াংশে সরাসরি নিয়োগ হয় এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ ইনস্পেক্টরদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে, যেখানে নারীদের জন্য সার্বিকভাবে ১০% কোটা সংরক্ষিত থাকে।

২) সাব-ইনস্পেক্টর হলো বাংলাদেশ পুলিশের সর্বোচ্চ নন-ক্যাডার (অথবা অধস্তন) পদ, যেখানে প্রার্থীরা সরাসরি নিয়োগ পেয়ে থাকেন। এই পদসমূহের ৫০% এ সরাসরি নিয়োগ হয় এবং বাকি পদসমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেক্টরদের পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এসকল পদে সরাসরি নিয়োগগুলি পুলিশ সদর কর্তৃক করা হয়ে থাকে।

---

13. Central Intelligence Agency website, The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html#People as on 25 November 2015

14. Staff Correspondent (2015). *"Govt gives final approval for Mymensingh as country's eighth administrative division"*, Bdnews24.com, 14 September: http://bdnews24.com/bangladesh/2015/09/14/govt-gives-final-approval-for-mymensingh-as-country-s-eighth-administrative-division as on 25 November 2015

15. These are Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal and Sylhet, please see: http://www.police.gov.bd/content.php?id=282 as on 25 November 2015

16. Bangladesh Police Website, http://www.police.gov.bd/career_child.php?id=247 as on 25 November 2015

17. Bangladesh Police Website, http://www.police.gov.bd/career_child.php?id=247 as on 1 December 2015

৩) সার্জেন্ট পদটি হলো পরবর্তী মধ্য-পর্যায়ের পদ। সকল সার্জেন্টকে পুলিশ সদর দপ্তর কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ করা হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র পুরুষরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারতো। ২০১৪ সালের মে মাস থেকে নারীরাও এই পদে আবেদনের সুযোগ পাচ্ছে।

৪) কনস্টেবল পদটি বাংলাদেশ পুলিশের সর্বনিম্ন পদ এবং এটিই প্রাথমিকভাবে প্রবেশ-পর্যায়ের পদ। প্রযোজ্য জেলার সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ এই পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া তদারকি করেন।

নারীদের জন্য একটি বিভিন্ন পদের একটি নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্দ রাখার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষণ নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে সরকারের অভ্যন্তরীণ নিয়োগ নীতিমালায় যুদ্ধ-আক্রান্ত নারীদের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ১০% আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। খুব স্বল্পসংখ্যক নারী এই কোটা গ্রহণ করতে আসার কারণে ১৯৮৫ সালে যুদ্ধ-আক্রান্ত নারী কোটা বিলুপ্ত করা হয় এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নারীদের জন্য ১০% কোটা বরাদ্দ করা হয়[18] যা এখনও বিদ্যমান। এছাড়াও দুইটি নন-গেজেটেড পদ, যেমন সাব- ইনস্পেক্টর এবং কনস্টেবল পদে ১৫% কোটা বরাদ্দ রয়েছে[19]।

২। পুলিশ বিভাগে নারীদের প্রবেশের ইতিহাস

বাংলাদেশ পুলিশ ১০০ বছরেরও আগে প্রণীত ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। পদমর্যাদাভিত্তিক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর দ্বারা তার সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রথম কয়েকটি পদক্ষেপের মধ্যে এই আইনটি অন্যতম। ১৮৬১ সালের এই আইনটিতে নারী পুলিশ বিষয়ক একেবারেই কোন বিধান নেই। এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই, কারণ এই আইনের উদ্দেশ্য এবং ইতিহাস বিবেচনা করলেই তার কারণ বোঝা যায়। এই ইতিহাস জানা সত্ত্বেও, স্বাধীনতার পর থেকে এখনো পর্যন্ত

বাংলাদেশে সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন পুলিশ আইন প্রয়োজন

পুলিশ বিভাগে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও নীতিগত পদক্ষেপসমূহকে উপলব্ধি করতে হবে যে, পুলিশ ব্যবস্থার মূল আইনটির আধুনিকায়ন এবং পরিবর্তন অপরিহার্য। পুলিশ ব্যবস্থা বিষয়ক আইন পুন:প্রণয়নের সর্বশেষ প্রয়াস ছিল ২০০৭ সালের খসড়া পুলিশ অর্ডিন্যান্স, যা ইতোমধ্যে পুরনো হয়ে গেছে। তারপরও অধিকতর গণতান্ত্রিক পুলিশ বিষয়ক আইন প্রণয়নের দিকে এটি প্রথম পদক্ষেপ ছিল। এই আইনে পুলিশ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ এবং দল-নিরপেক্ষ তদারকির জন্য জাতীয় পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রবিধান ছিল। এছাড়াও একটি সরকারী পুলিশ অভিযোগ কমিশন গঠনেরও প্রবিধান ছিল এই আইনে[20]। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই অর্ডিন্যান্সেও পুলিশ বিভাগে নারীকে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিধান রাখা হয়নি[21]। আসন্ন যেকোনো নতুন খসড়া আইনে অন্ততপক্ষে পুলিশ বিভাগে নারীর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক বিধান থাকা উচিৎ। যদি তা সম্ভব না হয়, অন্ততপক্ষে নারীদের জন্য একটি কোটা বরাদ্দ করা উচিৎ।

---

18. Yasmin, S. (2010), "*Quota System in Bangladesh Civil Service: An Appraisal*", Institute of Governance Studies, BRAC University, January 2010: http://dspace.bracu.ac.bd/bitstream/handle/10361/2085/Quota%20System%20in%20Bangladesh%20Civil%20Service%20An.pdf?sequence=1 as on 25 November 2015

19. সাব- ইনস্পেক্টর এবং কনস্টেবল পর্যায়ের প্রবেশমূলক পদে নারীদের জন্য ১৫% কোটা বরাদ্দ থাকার তথ্যটি বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক সিএইচআরআই কে ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

20. International Crisis Group (2009), *Bangladesh: Getting Police Reform on Track*, p. 4: http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-asia/bangladesh/182%20Bangladesh%20Getting%20Police%20Reform%20on%20Track.pdf as on 25 November 2015

21. Commonwealth Human Rights Initiative (2007), *Bangladesh Police Ordinance, 2007 (Draft), Analysis, Critique and Recommendations for Amendments*: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/aj/police/Police_Ordinance_2007-Critique-FINAL.pdf as on 25 November 2015

পুলিশ বিভাগে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ কাঠামোগত সংস্কার সাধিত হয়নি। পুলিশের কাজ পুরুষের কাজ, এই ধারণা এখনও টিকে আছে। এটিকে এখনও পুরুষের কাজ বলে বিবেচনা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ নয় যে পুলিশ বিভাগে পুরুষদের প্রাধান্য বিদ্যমান। আন্তর্জাতিকভাবেও বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে পর্যন্ত পেশাদার পুলিশ সংস্থাসমূহ নারীদেরকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর আগে যেখানে স্বল্পসংখ্যক নারীকে পুলিশ বাহিনীতে কাজের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো, তারা মূলত পুরুষ কর্মকর্তাদেরকে সহযোগিতা করতেন অথবা সমাজ কল্যাণমূলক সীমিত কর্মপরিসরে কাজ করতে পারতেন, যেমন, স্কুল, কিশোর কল্যাণ এবং এসম্পর্কিত ক্ষেত্রসমূহে[22]।

১৯৭৪ সালে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এর নন-ক্যাডার পদে ১৪ জন নারীর যোগদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের পদমর্যাদাগত কাঠামোতে নারীদের যাত্রা শুরু হয়[23]। প্রথমদিকে নিয়োগপ্রাপ্ত এসকল নারী পুলিশ সদস্য মূলত ভিআইপি এবং আনুষ্ঠানিক কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন[24]। ১৯৭৬ সালে নারীরা মেট্রোপলিটন পুলিশে যোগদান করেন[25]।

১৯৮৬ সালে ফাতেমা বেগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ পদে যোগদানে মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পুলিশের ক্যাডার পর্যায়ের পদে নারীদের যোগদান শুরু হয়[26]। ১৯৮৮ সালে আরও চারজন নারী ক্যাডার পর্যায়ে যোগদান করেন। এই পর্যায়ে নারীদের পুলিশ বিভাগে নিয়োগ করা হলেও, তারা তাদের সহকর্মিদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেতেন না। জ্যেষ্ঠ পুরুষ কর্মকর্তাবৃন্দ নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত নারী সদস্যদের সক্ষমতা নিয়ে সকলের সামনেই প্রশ্ন তুলতেন। তারা পুলিশে যোগদান করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও, এই নারীদের মধ্যে কিছু নারীকে পুলিশ বিভাগ ব্যতীত সিভিল সার্ভিসের অন্য কোন বিভাগে যোগদান করতে বলা হয়[27]।

অনিবার্যভাবেই নিয়োগপ্রাপ্ত এই স্বল্পসংখ্যক নারী সদস্যদেরকেও কিছুদিনের মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সামরিক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান পুলিশ বিভাগের ক্যাডার পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ বাতিল করার জন্য সুপারিশ করেন। এই সুপারিশের পিছনে তার যুক্তি ছিল যে, নারীরা এসকল সিনিয়র/তদারকিমূলক পদে দায়িত্বপালনে সক্ষম নন[28]। সামরিক সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করে এবং ক্যাডার পর্যায়ের পদে নারীদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। নারীদের জন্য ক্যাডার পর্যায়ের নিয়োগ বাতিল হওয়ার এক বছরের মধ্যেই জেনারেল এরশাদ[29] এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই সামরিক সরকারের পতন ঘটলেও নিয়োগ সংক্রান্ত এই স্থগিতাদেশ পুরো দশ বছর বলবত ছিলও।

22. Prenzler, T & Sinclair, G, (2013), '*The status of women police officers: An international review*', International Journal of Law, Crime And Justice, 41(2), pp. 115–131, http://oro.open.ac.uk/36665/1/Status%20of%20women%20police%20an% 20international%20review.pdf as on 25 November 2015

23. জাতীয় সিভিল সার্ভিস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদানকৃত সদস্যদেরকে ক্যাডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পুলিশ বিভাগ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগকৃত সদস্যদেরকে নন- ক্যাডার হিবে উল্লেখ করা হয়।

24. নারী ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার, এপ্রিল ২০১৪।

25. ৬-৮ অক্টোবর ২০১৫ তে ভারতের হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আইন প্রয়োগে নারী-নেতৃত্ব, সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শামীমা বেগম কর্তৃক পরিবেশিত বক্তব্য।

26. বর্তমানে ফাতেমা বেগম বাংলাদেশ পুলিশ স্টাফ কলেজের রেক্টর পদে কর্মরত। তার জীবন বৃত্তান্ত নিচের লিঙ্কে: http://www.psc.gov.bd/index.php/biography-of-rector/

27. ১৯৮৮ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত নারী ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে এপ্রিল, ২০১৪ তে গ্রহণকৃত সাক্ষাৎকার।

28. Razzak, R (2008), *Women in the Police Service*. The New Nation, February 21, 2008, http://www.prp.org.bd/Media/21feb 2008.pdf as on 25 November 2015

29. Staff Correspondent (2015), "*PM's Special Envoy HM Ershad says Women Leaders are Only 'Showpieces'*", Bdnews24.com, June 29, 2015, http://bdnews24.com/politics/2015/06/29/pms-special-envoy-hm-ershad-says-women-leaders-are-only-showpieces. প্রাক্তন জেনারেল এরশাদের সম্প্রতি সংসদের প্রদত্ত নারী বিরোধী বক্তব্য (যেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাদের "শো-পিস" হিসেবে উল্লেখ করেন) বিবেচনা করলে তার আমলে ক্যাডার পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ স্থগিত করার আদেশের পেছনে যে তার লিঙ্গগত পক্ষপাতিত্ব ছিল তা বলা বাহুল্য।

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৯৯৮ সালে পুনরায় বাংলাদেশ পুলিশের অফিসার পদে নারীদের নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। সেই থেকে ক্যাডার পদে নারী কর্মকর্তাদের উত্থান চলমান রয়েছে। তবুও সেই হারানো দশটি বছর পুলিশ বিভাগে নারীদের পেশাগত বিকাশকে রোধ করেছে এবং পুরুষ প্রাধান্যের একটি উপ-সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করেছে, যার ছাপ এখনও বিদ্যমান।

দীর্ঘস্থায়ী ইতিহাস

এই ইতিহাস থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থায় নারীরা আজও যে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহের শিকার হন, তার মূলে রয়েছে সিনিয়র ক্যাডার পদে নারী সম্পর্কে আগের ধারণাই বিদ্যমান। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইংরেজি ভাষায় পর্যাপ্ত লেখা না পাওয়ায় এই বিষয়টির বেশি গভীরে যাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। এই ইতিহাস সম্পর্কে, বিশেষ করে যেই প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এক দশক যাবত ক্যাডার পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ বন্ধ ছিল সেটি ভবিষ্যতের গবেষণাসমূহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

৩। বাংলাদেশ পুলিশ নারীর প্রতিনিধিত্ব

বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনশক্তি ১,৫৫,৮৯১ জন। এর মধ্যে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নারীর সংখ্যা ছিল ৮,৮২৭ জন, যা মোট সদস্য সংখ্যার ৬.০৩%[30]। তবে একটি আশাব্যঞ্জক দিক হলো, ২০১৪ সালের তুলনায় পুলিশ বাহিনীতে নারীর সংখ্যা ১.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে নারীর সংখ্যা ছিল ৬,৮৫৩ জন। এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বৃদ্ধি বেশ উল্লেখযোগ্য। ২০০৭-২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগে নারীর সংখ্যা ১.৮৭% থেকে ৪.৬৩% উন্নীত হয়, যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি।

নিম্নোক্ত ছকে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশের বিভিন্ন পদে নারী সদস্যদের সংখ্যা বর্ণীত হয়েছে:

পদবী	নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা
অ্যাডিশনাল ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (অতি: আইজিপি)	১
ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল (ডিআইজি)	২
অ্যাডিশনাল ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল (অতি: ডিআইজি)	২
সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসপি)	১৯
অ্যাডিশনাল সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ (অতি: এসপি)	৬৬
সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ (সিনিয়র অ্যাস এসপি)	৭
অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এএসপি)	১৬১
ইনস্পেক্টর	৮৩
সাব- ইনস্পেক্টর (এসআই)	৪৭৬
সার্জেন্ট	২৮
অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেক্টর (এএসআই)	৪৪৬
কনস্টেবল	৭,৫৩৬
মোট	৮,৮২৭

30. ৬-৮ অক্টোবর ২০১৫ তে ভারতের হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আইন প্রয়োগে নারী-নেতৃত্ব, সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শামীমা বেগম কর্তৃক পরিবেশিত বক্তব্যে এই পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়।

বর্তমানে পুলিশ বিভাগে কর্মরত ৮,৮২৭ জনের মধ্যে ২৫৮ জন ক্যাডার পর্যায়ের। ১,০৩৩ জন মধ্য-পর্যায়ের পদসমূহে কর্মরত, যেমন ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই), সার্জেন্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেক্টর (এএসআই) ইত্যাদি। তবে অধিকাংশই (৭,৫৩৬ জন; ৮৫%) কনস্টেবল পদে কর্মরত[31]। নারী সদস্যদের সংখ্যা নিচের দিকের পদসমূহেই বেশী হলেও, ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নারী পুলিশ সদস্যদের মোট সংখ্যার বৃদ্ধি দেখে পুলিশ বাহিনীতে আরও অধিক নারী সদস্য নিয়োগের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ মেলে। বেশিরভাগ নিয়োগ কনস্টেবল পর্যায়ে হলেও নিশ্চিতভাবেই উচ্চ ব্যবস্থাপনামূলক পদসমূহেও নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ নিম্ন পর্যায়ের পদসমূহে নারী প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্য এবং উচ্চ পর্যায়ের পদেও নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৪ সালের মে মাসে সার্জেন্ট পদে নারীর আবেদন করার প্রতিবন্ধকতা তুলে নেয়া প্রমাণ করে যে, পুলিশ ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। উপরের ছকে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এই তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে ২৮ জন নারী সার্জেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

২০০৬ সালে শুরু হওয়া বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এর পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির (পিআরপি) সহ-অংশিদারিত্ব পুলিশ বিভাগে নারীর নিয়োগ এবং অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান রেখেছে। পুলিশ বাহিনীতে নারী পুলিশের অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ পিআরপি এর সাথে আরও কয়েকটি বিষয়ে সুপারিশ এবং নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যেমন, ন্যায় বিচারের অধিকার, অপরাধ দমন, তদন্ত, পুলিশ প্রশিক্ষণ, কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি[32]।

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের ২০০৮-২০১০ সালের জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনায় "নারী-পুরুষ নিরপেক্ষতা" কে একটি মৌলিক মূল্যবোধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে উক্ত বিষয়ে আন্তরিক এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়। পুলিশ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করতে এই পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে ছিল, পুলিশ বাহিনীতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য স্থির করা; নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক একটি অভ্যন্তরীণ নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করা এবং নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও এই পরিকল্পনায় একটি "সম্ভাব্যতা নিরূপণ" প্রক্রিয়া এবং নারীদের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ব্যবস্থা, যেমন, বিপিডব্লিউএন এর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এসকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড এবং লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করার জন্য একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়[33]।

বিপিডব্লিউএন: সহযোগিতার মাধ্যমে জন্ম নেয়া একটি অসাধারণ পদক্ষেপ

২০০৮ সালে, বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ, পিআরপি এর সহযোগিতায়, "বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্ক (বিপিডব্লিউএন)" প্রতিষ্ঠা করে। এটি একটি সংগঠিত এবং নিবেদিত নেটওয়ার্ক যা বাংলাদেশের নারী পুলিশের ভূমিকার উন্নয়নে কাজ করে। বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে একজন নারী এই নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে বিবেচ্য হয়। এই নেটওয়ার্ক নারী পুলিশদের সহযোগিতা, তথ্য এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সক্রিয়, সংগঠিত এবং বিস্তৃত উৎস হিসেবে বিরাজ করে। বিপিডব্লিউএন এর লক্ষ্য হলো দক্ষতা সৃষ্টি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী নেতৃত্বকে সমুন্নত করা। এছাড়াও পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে বিপিডব্লিউএন নারী পুলিশদের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। প্রতিনিধিত্বমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উৎসাহিত করতে সকল পদমর্যাদা এবং অঞ্চল থেকে সদস্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিপিডব্লিউএন এর ২৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিপিডব্লিউএন বর্তমানে পিআরপি কর্তৃক আর্থিক সহযোগিতা লাভ করছে।

---

31. কনস্টেবল এবং অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টরের মাঝে নায়েকের পদটি রয়েছে। তবে বাংলাদেশে এই নায়েক পদে কোনও নারী কর্মরত নেই।

32. United Nations Police Reform Programme website, www.prp.org.bd as on 25 November 2015

33. Bangladesh Police, *Strategic Plan Bangladesh Police (2008-2010)*, PART III, Action Plan: Goals/Objectives Strategy and Timeline, pp. 9-16, http://www.prp.org.bd/downloads/strategic%20plan.pdf.

নীতিমালাগত দিক থেকে নারীর অধিকার এবং নারী পুলিশদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পিআরপি এর প্রচেষ্টায় দুইটি অনবদ্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেমন, জেন্ডার বিষয়ক গাইড দিকনির্দেশনা এবং খসড়া জেন্ডার ও বৈষম্যবিরোধী নীতিমালা। জেন্ডার বিষয়ক দিকনির্দেশনাটি বহির্মুখী, যা নারী ও শিশুদের প্রতি পুলিশের আদর্শ আচরণ বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। যেমন অপরাধের শিকার কোনও নারীর প্রতি একজন পুলিশ সদস্যের দেহভঙ্গি এবং শব্দ চয়ন কীরকম হবে সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। এই দিকনির্দেশনা সকল থানাতে পাঠানো হয়েছে[34]।

খসড়া জেন্ডার ও বৈষম্যবিরোধী নীতিমালাটি অন্তর্মুখী এবং এতে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রস্তুতের সময়ে উক্ত খসড়া নীতিমালাটি বিপিডব্লিউএন কর্তৃক পর্যালোচিত হচ্ছে। বিপিডব্লিউএন এর পর্যালোচনার পর এটি অনুমোদন এবং পরবর্তী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে পাঠানো হবে। এই খসড়া নীতিমালাটি দক্ষিণ এশিয়ায় জেন্ডার নীতিমালা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এর একটি অন্যতম প্রচেষ্টা এবং নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের পুলিশ ব্যবস্থায় একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ। আশা করা হচ্ছে যে জেন্ডার নীতিমালাটি শিগগিরই গৃহীত হবে।

খসড়া জেন্ডার ও বৈষম্য বিরোধী নীতিমালাটির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

বাস্তবায়ন হলে যেসকল প্রাতিষ্ঠানিক বৈসাদৃশ্য নারীদের চাকরি এবং কর্ম-পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে, এই জেন্ডার নীতিমালাটি সেই সকল বিষয় বিবেচনা করবে। এই খসড়ায় নারী পুলিশদের উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার, নীতিমালা এবং পদক্ষেপের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে:

- নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি, বদলি, নিয়োগ-স্থান (posting), এবং আবাসন;
- যথাযোগ্য বিশ্রামাগার/শৌচাগার এবং আবাসন;
- সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চাকরি অবস্থায় প্রশিক্ষণ;
- জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ;
- শান্তি-রক্ষা মিশন এবং অন্যান্য থানাতে প্রেরণ;
- যৌন হয়রানি বিষয়ে অনাপোষী নীতিমালা; এবং
- ডে-কেয়ার সেবার প্রবিধান।

এতে এসকল নির্দেশনার বাস্তবায়ন পরীবেক্ষনের জন্য একটি ব্যবস্থারও রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে[35]।

নারী-পুরুষের সমতা অর্জন করতে এখনও অনেক কাজ বাকি থাকলেও বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে নারীদের নিয়োগ এবং সহযোগিতার জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দৃঢ় অঙ্গীকারের সাক্ষ্যই বহন করে। প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে ২০০৭ সালের ১.৮৭% নারী পুলিশ থেকে ২০১৩ সালের ৪.৬৩% এবং ২০১৫ সালের ৬.০৩% থেকেই বোঝা যায় যে সম্পদ এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা সম্বলিত কোনও প্রতিশ্রুতি কতটা সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা

নারীদের উন্নত সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির আরেকটি নিদর্শন হলো কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা। বাংলাদেশে যৌন হয়রানি বিষয়ক বলিষ্ঠ মানদণ্ড থাকলেও এই বিষয়ে কোনও আইন নেই। বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় জাতীয় পর্যায়ে হয়রানি বিষয়ক অনাপোষী প্রবিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। হাইকোর্ট প্রদত্ত একটি আদেশে যৌন হয়রানির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে এবং একে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই আদেশে পুলিশ বিভাগসহ সকল নিয়োগকারীকে এ বিষয়ক অভিযোগের প্রতিকার সাধনের জন্য "একটি যথাযথ এবং কার্যকরি

34. Police Reforms Programme, UNDP Bangladesh (2007), *"Gender Guidelines for Model Police Stations"*, http://prp.org.bd/downloads/GG.pdf (available in Bangla only) as on 25 November 2015

35. ৬-৮ অক্টোবর ২০১৫ তে ভারতের হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আইন প্রয়োগে নারী-নেতৃত্ব, সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রামকে প্রতিনিধিত্বকারী মিস ফওজিয়া খোন্দকারের বক্তব্য।

ব্যবস্থা" প্রচলনের জন্য দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে[36]। প্রত্যেক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ এবং তার তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধিকাংশ সদস্য হবে নারী এবং অন্ততপক্ষে দুইজন হতে হবে অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের, যাদের জেন্ডার জাস্টিস বিষয়ক দক্ষতা রয়েছে। হাইকোর্ট সকল নিয়োগকারী এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এই দিকনির্দেশনা সম্বলিত পুস্তিকা প্রস্তুত এবং প্রকাশ করার মাধ্যমে সকল কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্ব প্রদান করতে নির্দেশনা প্রদান করেছে।

উপরোক্ত আলোচনার এবং সাম্প্রতিক সকল অগ্রগতির আলোকে বলা যায় যে, ২০১২-২০১৪ সালে জন্য প্রণীত বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের কৌশলগত পরিকল্পনায়[37] পুলিশ ব্যবস্থায় নারীর বিষয়ে গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া একটি বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। এতে জেন্ডার বিষয়টি শুধুমাত্র একটি স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাহলো নারীর প্রতি সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সাথে পুলিশের আচরণ বিষয়ক[38]। এতে মনে হতে পারে যে বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি পুলিশ বিভাগের জন্য এখন আর অগ্রাধিকার নয়। সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো আসলে বিষয়টি সেরকম নয়। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহের নিয়োগ সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। একইসাথে পুলিশ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের জন্য অধিকতর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

পরিশেষে পুলিশ বিভাগের ভেতরে অথবা অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে, নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টি সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সমান সুযোগ এর অধিকারের আলোকে দেখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধান নারীদের জন্য আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সমান সুযোগ লাভের অধিকার এর সুরক্ষা প্রদান করে, একই সাথে ধর্ম, জাতি, গোত্র, লিঙ্গ এবং জন্মস্থান এর ওপর ভিত্তি করে যেকোনো প্রকারের বৈষম্য থেকেও সুরক্ষা প্রদান করে[39]। একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বৈধতা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনগণের বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব এবং তাদের সেবার ওপর। পুলিশ ব্যবস্থায় চলমান পুরুষ প্রাধান্য থেকে বোঝা যায় যে নারী-পুরুষের সমান প্রতিনিধিত্ব সময় সাপেক্ষ। তবে পুলিশ বিভাগকে নিরপেক্ষ এবং কার্যকর করে তুলতে হলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন অপরিহার্য।

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে, অনুচ্ছেদ ২ এ শর্ত সংরক্ষণ (reservation) বজায় রেখে, জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুসমর্থন/স্বাক্ষর করে[40]। এছাড়াও নারী-পুরুষের সমতার বিধান সম্বলিত কিছু জাতীয় নীতিমালা রয়েছে, যেমন জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১[41] এবং ভিশন ২০২১[42]।

---

36. ***Bangladesh National Women Lawyers Association v Bangladesh and others 14 BLC (2009) 694***

37. ২০১০-২০১২ সালের জন্য কোনও নতুন কৌশলগত পরিকল্পনা ছিল না। ফলে ২০১২-২০১৪ এর পরিকল্পনা ২০০৮-২০১০ এর উত্তরসূরীহয়ে ওঠে।

38. Bangladesh Police (2012), *Strategic Plan Bangladesh Police (2012-14)*, http://www.police.gov.bd/userfiles/file/Statigic_Plan_14-11-12_color_print.pdf.

39. See Articles 10, 19, 28 and 29 of the Constitution of Bangladesh, 1972 at Commonwealth Legal Information Institute, Constitution of the People's Republic of Bangladesh: http://www.commonlii.org/bd/legis/const/2004/index.htm as on 25 November 2015

40. CEDAW South Asia website, Ratification Status, http://cedawsouthasia.org/regional-overview/ratification-status-in-south-asia

41. Bangladesh National Portal of Ministry of Women and Children Affairs (2011), National Women Development Policy 2011, http://mowca.portal.gov.bd/sites/default/fi les/fi les/mowca.portal.gov.bd/policies/64238d39_0ecd_4a56_b00c_b834cc54f88d/National-Women-Policy-2011English.pdf as on 25 November 2015

42. Centre for Policy Dialogue, Bangladesh Vision 2021, http://saber.eaber.org/sites/default/files/documents/Bangladesh%20Vision%202021.pdf (last visited on Nov.25, 2015).

জরিপের ফলাফল

জরিপে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ফলাফল এবং তথ্য উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে তাদের যেসকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। আমরা আশা করছি যে, নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগ এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা করবে যা তাদের নীতিমালায় প্রতিফলিত হবে।

১। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা এবং পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

নারী পুলিশদের ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা এবং পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা এই বিষয়সমূহকে চারটি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং জরিপে আলোচনা করেছি। কেন তারা পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেছে, এই প্রশ্নের উত্তরে দেশজুড়ে নারী কনস্টেবল, ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরগণ কিছু বৈচিত্র্যময় এবং কিছু সাধারণ মতামত ব্যক্ত করেন।

পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের ব্যক্তিগত কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারী পুলিশগণ বৈচিত্র্যময় মতামত ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ, যেমন নিজের এবং তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহ। একজন উত্তরদাতা বলেন, "পরিবারে বড় সন্তান হিসেবে, আমার ছোট ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্বপালন এবং পরিবার ও জনগণের সেবা করার লক্ষ্যে আমার ইচ্ছে ছিল একটি সরকারী চাকরি করা।" অনেকে তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। একজন উত্তরদাতার মর্মস্পর্শী উত্তর ছিল "আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার কন্যা। আমার জন্মের আগেই, এসআই পদে চাকরিরত অবস্থায় বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমি পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করি"।

উত্তরদাতাদের মধ্যে কেউ কেউ পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের কারণ হিসেবে জাতীয় ও নাগরিক মর্যাদা ও দায়িত্ববোধের কথা উল্লেখ করেন। একজন উত্তরদাতা বলেন "আমি সবসময় মনে করি যে দেশের শান্তি রক্ষায় পুলিশ বিভাগ একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে। আমি জানতাম যে পুলিশ বিভাগে যোগদানের মাধ্যমে আমি দেশের এবং আমার নিজের জন্য ভালো কিছু করতে পারবো"।

আরেকজন নারী বলেছেন যে, "আমার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল যে আমি পুলিশ বিভাগে কাজ করার মাধ্যমে মানুষের সেবা করবো"। পেশা হিসেবে পুলিশের চাকরি সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, "পুলিশ বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। তাদেরকে মানুষের সাথে অনেক কাজ করতে হয়। এখানে সত্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে সম্মানিত আদালতের সামনে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করার সুযোগ রয়েছে"।

অনেকে পুলিশের অপরাধ প্রতিরোধ এবং নারী/৬৬৬৬৬টচ[=---- শিশুসহ অসহায় মানুষের সুরক্ষা প্রদানের সামর্থ্যের কথা বলেছেন। একজন নারী বলেছেন, "আমাদের দেশে নারীরা পুরুষদের দ্বারা অবহেলিত এবং নির্যাতিত। তাই নারীদের পাশে থাকতে এবং নারীদের অধিকার রক্ষা করতে আমি পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেছি। এছাড়া এটি একটি ব্যতিক্রমী এবং সম্মানজনক পেশা"।

পরিশেষে, কয়েকজন উত্তরদাতা জানান যে, পুলিশ বিভাগে যোগদান করার মাধ্যমে তারা নারীদের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। একজন উত্তরদাতা বলেন, "নারীদেরকে সবসময় একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে তাদের জীবন পার করে দিতে হয়, যেমন বাবার বাড়িতে জন্ম নেয়া এবং তারপরে বিয়ে। আমি এর বাইরে বের হতে চেয়েছিলাম বলেই আমি পুলিশ বিভাগে যোগদান করি"। এই ধরনের আবেগের সাথে দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বের পরিচয় দেয়ার আকাঙ্ক্ষা জড়িত থাকে। একজন নারী বলেন, "আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে

জাগাতে, মানুষের সেবা করতে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে এবং আমিও পারি এটি প্রমাণ করার লক্ষ্যে পুলিশ বিভাগে যোগদান করি"। আরেকজন নারী জানান, "আমি আমার সাহস ও দক্ষতা প্রমাণ করতে পুলিশে যোগদান করি"।

এ কথা স্পষ্ট যে পুলিশে যোগদান করার পেছনে নারীদের বৈচিত্র্যময় এবং মর্মস্পর্শী অনেক কারণ রয়েছে। তারা দেশে সুরক্ষা এবং উত্তম আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অনেকেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার কথা জানান। এটি লক্ষণীয় যে বেশ কয়েকজন উত্তরদাতা তাদের নিজেদের এবং অন্য নারীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা তাদের পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং একই সাথে নারীদের সামাজিক অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে একথা জানান।

তবে পরিবারের সমর্থন না থাকলে তা একজন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারীর ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে তার যদি কোনও সন্তান থাকে। নারীদের পেশাগত জীবনে তার পরিবারের সমর্থনের বিষয়ে জানতে আমরা জরিপের উত্তরদাতাদেরকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করেছিলাম: ১) তাদের পরিবার কি তার পুলিশে যোগদান করার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলো? ২) তাদের পরিবার কি তার পুলিশের চাকরি চলমান রাখাকে সমর্থন করে?

নারী ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরদের অধিকাংশই জানান যে তাদের পরিবার তার পুলিশে যোগদানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল এবং চাকরি চলমান রাখার বিষয়টি পছন্দ করে। শুধুমাত্র একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর নারী জানান যে পরিবার তার পুলিশে যোগদানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি এবং চাকরি চলমান রাখার বিষয়টিও পছন্দ করে না।

একইভাবে, নারী কনস্টেবলদের অধিকাংশই জানান যে তাদের পরিবার তার পুলিশে যোগদানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলো এবং চাকরি চলমান রাখাকে সমর্থন করে। তিনজন নারী কনস্টেবল উভয় প্রশ্নের উত্তরেই "না" বলেছেন।

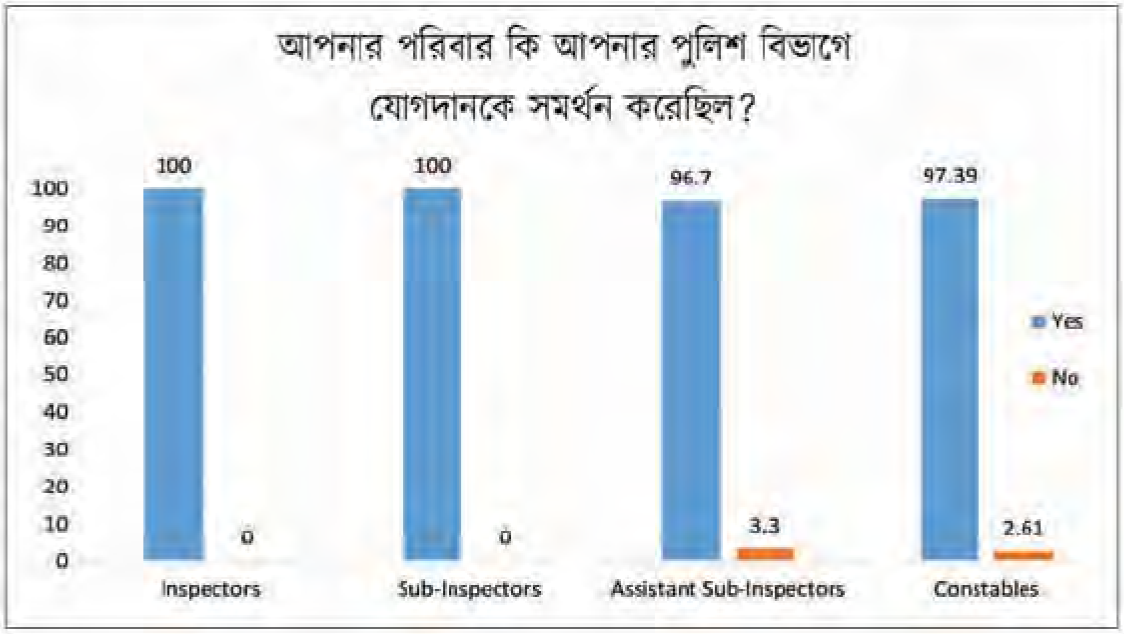

একজন নারী কনস্টেবল জানান যে, পরিবার তার পুলিশে যোগদানের সিদ্ধান্তকে প্রথমে সমর্থন করলেও এখন আর করছে না। আবার আরেকজন বলেন যে, প্রথমে তাদের পরিবার তার পুলিশে যোগদানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেনি, কিন্তু এখন পছন্দ করছে।

এই তথ্য থেকে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বেশিরভাগ নারী পুলিশের পরিবার তার পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের বিষয়টিকে সমর্থন করে। এতে আরও দেখা যাচ্ছে যে, কিছু নারী পুলিশ সদস্য তার পরিবার থেকে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের চাকরি এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পুলিশ বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের জরিপে জানা যায় যে, সত্যিকার অর্থেই পুলিশ বিভাগের মতো একটি ব্যস্ত চাকরি করে পেশাগত জীবন এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পরিবারের সমর্থন কতটা অপরিহার্য। একজন ক্যাডার পর্যায়ের কর্মকর্তার মতে, "পরিবারের সমর্থন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই যারা নতুন চাকরিতে যোগদান করতে চায় তাদের আমরা বলি যে, পরিবারের সমর্থন না থাকলে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করো না"।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নারী পুলিশের পারিবারিক এবং কর্মজীবনের ভারসাম্য রাখতে সহায়তা করার জন্য পুলিশ বিভাগকে অবশ্যই কিছু কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসকল নারীর পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করার জন্য ব্যক্তিগত উৎসাহ রয়েছে কিন্তু পরিবারের সমর্থন নেই, সেসকল পরিবারসমূহকে বোঝানোর জন্য সামাজিক সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। খসড়া জেন্ডার নীতিমালা অনুসারে গ্রামীণ অঞ্চলগুলোকে লক্ষ্য করে প্রচলিত গণমাধ্যম এবং ইউনিয়ন পরিষদ[43] ও পল্লীসমাজের[44] মতো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাজে লাগিয়ে সরকার পুলিশ বিভাগের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করতে পারে। এসকল তথ্যের ধারাবাহিকতা থেকে একটি ইতিবাচক দিক প্রতীয়মান হচ্ছে, আর তাহলো, বাংলাদেশের নারীরা পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসবে এবং তাদের পরিবারবর্গ তাদেরকে সমর্থন করবে। এটি রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মাধ্যমের চেয়ে বেশি কার্যকরি এবং বিস্তৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে কাজ করবে।

পরিবারের সদস্যদের মতামত নারী পুলিশের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব ফেলে, কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পুলিশ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানের ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রসঙ্গে আরও গভীর নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নারী পুলিশের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আমরা তাদেরকে দুইটি বিষয়ের ওপর বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছি, এক, পুরুষ পুলিশদের তুলনায় নারী পুলিশদের কী পরিমাণ ক্ষমতা রয়েছে, দুই, জনগণ তাদেরকে কীরকম শ্রদ্ধা করে।

43. ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে ক্ষুদ্রতম ইউনিট। বিস্তারিতঃ http://www.kabirhat.com/union_parishad.html

44. পল্লীসমাজ হলো, ব্র্যাক কর্তৃক গঠিত কমিউনিটি বেসড সংগঠন যা গ্রামীণ দরিদ্রদের, বিশেষ করে নারীদের, ক্ষমতায়নের জন্য ফোরাম হিসেবে কাজ করে। বিস্তারিতঃ http://cep.brac.net/community-institution-building

প্রথমত, ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর এবং কনস্টেবলদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তাদের মতে তারা তাদের পুলিশের পোশাকের জন্য পুরুষ পুলিশের তুলনায় কীরকম ক্ষমতা লাভ করে, সমান, বেশি, নাকি কম?

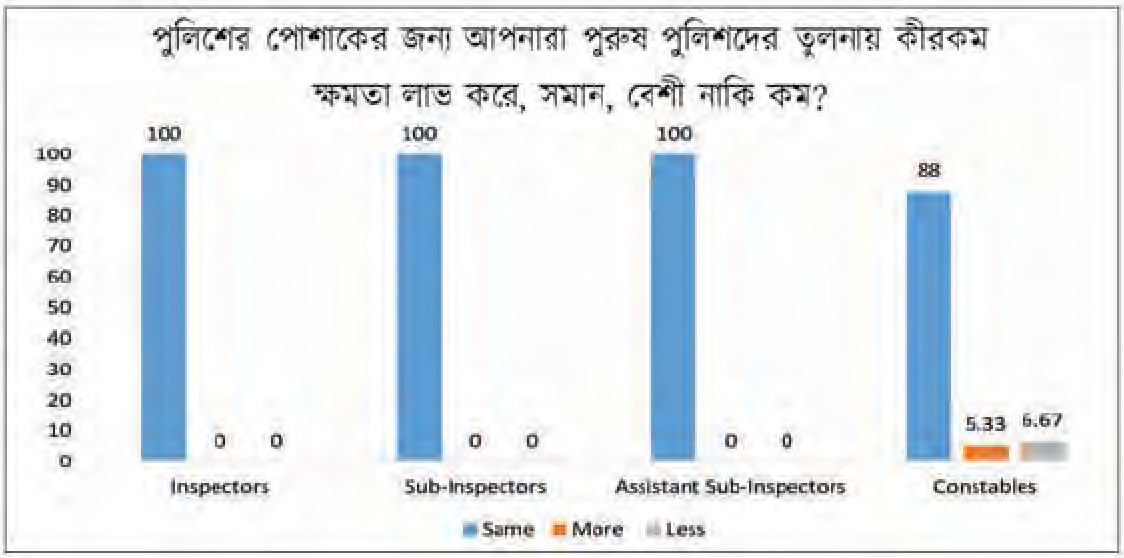

এই জরিপে[45] অংশগ্রহণকারী মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রত্যেকে মনে করেন যে, তাদের পুলিশের পোশাক তাদেরকে পুরুষ কর্মকর্তাদের সমান ক্ষমতা দিয়ে থাকে। অংশগ্রহণকারী নারী কনস্টেবলদের কাছ থেকে মিশ্র মতামত পাওয়া যায়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৫৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে চারজন এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। বাকিদের মধ্যে ১৩২ জন (৮৮%) মনে করেন, তাদের পুলিশের পোশাক তাদেরকে পুরুষ সহকর্মিদের সমান ক্ষমতা প্রদান করে, ১০ জন (৭.৬৭%) জানান যে, এটি তাদেরকে তুলনামূলক কম ক্ষমতা দেয়, এবং আটজন (৫.৩৩%) জানান যে, এটি তাদেরকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে জরিপে অংশগ্রহণকারী নারী পুলিশদের অধিকাংশই পুরুষদের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন বোধ করেন। পুলিশ হিসেবে সেবা প্রদানের সময়ে, তারা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের তুলনায় নিজেদেরকে কোনও অংশেই কম মনে করেন না।

এরপর উভয় পর্যায়ের নারী পুলিশদেরই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "আপনার মতে, জনগণ কি নারী পুলিশকে পুরুষ পুলিশের তুলনায় কেমন শ্রদ্ধা করে? বেশি, নাকি কম, না সমান"?

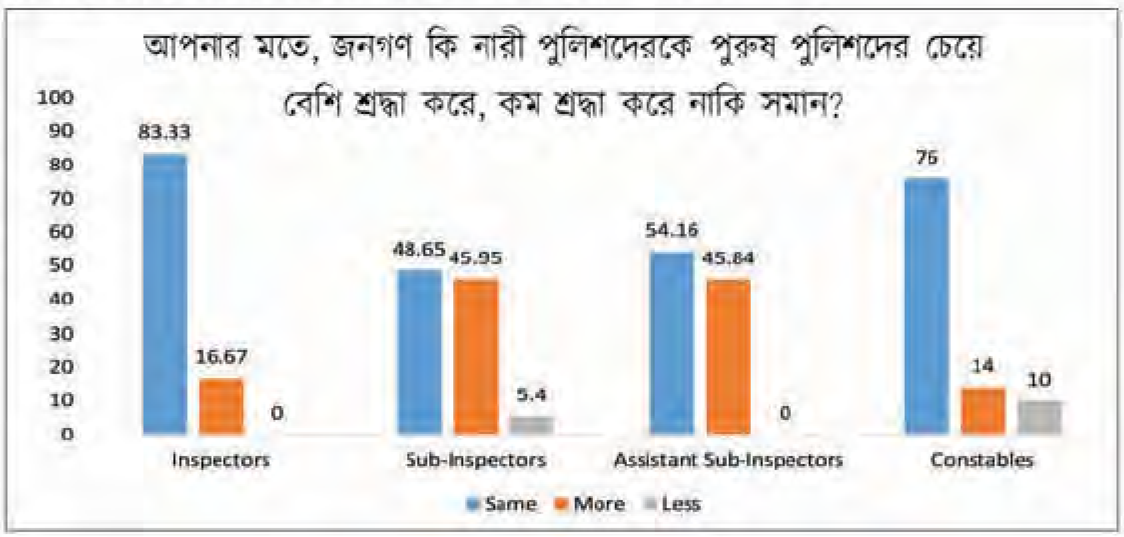

45. ৭৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ছয়জন এই প্রশ্নটির উত্তরটি শূন্য রাখেন।

এই প্রশ্নের[46] উত্তরে, মধ্যম পর্যায়ের ৩৬ জন (৫৩.৭৪%) নারী পুলিশ জানান, তারা মনে করেন যে জনগণ তাদেরকে পুরুষ পুলিশের সমান মর্যাদাই দিয়ে থাকে, ২৯ জন (৪৩.২৮%) মনে করেন, জনগণ তাদেরকে পুরুষের চেয়ে বেশি মর্যাদা প্রদান করে। শুধু দুজন (২.৯৮%) মনে করেন, তারা পুরুষ পুলিশের তুলনায় কম মর্যাদা পান। উপরের ছকে বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশের উত্তর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদা সম্পর্কিত একই প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা ১৫০ জন নারী কনস্টেবলের মধ্যে ১১৪ জন (৭৬%) জানান যে, জনগণ তাদেরকে পুরুষ সহকর্মিদের সমান সম্মান করেন। তবে ১৫ জন (১৪%) মনে করেন, জনগণ তাদেরকে কম সম্মান করে এবং ২১ জনের মতে, জনগণ তাদেরকে বেশি সম্মান করে থাকে।

একটি উল্লেখযোগ্য তুলনায় দেখা যায়, যদিও শুধু ৬.৬৭% নারী কনস্টেবল মনে করেন, পুলিশের পোশাক তাদেরকে স্বল্প ক্ষমতা দিয়ে থাকে, ১০% নারী কনস্টেবল মনে করেন, জনগণ তাদেরকে পুরুষ কনস্টেবলদের চেয়ে কম সম্মান করে।

এই জরিপ মতে, সিনিয়র নারী পুলিশের তুলনায় অধিকাংশ নারী কনস্টেবল মনে করেন, জনগণ তাদেরকে তাদের পুরুষ সহকর্মিদের চেয়ে কম সম্মান করে। এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, কনস্টেবল পদটি সবচেয়ে জুনিয়র পদ হওয়ার কারণে, দীর্ঘদিন যাবত পুলিশের উচ্চপদে চাকরি করা নারীদের তুলনায়, নারী কনস্টেবলরা ততটা আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন না। এছাড়াও জনগণ হয়তো পুলিশের লিঙ্গ এবং পদমর্যাদার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন মাত্রার সম্মান প্রদর্শন করে। এটি স্পষ্ট যে, উত্তরদাতাদের দেওয়া উত্তরে হয়তো তাদের ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। বলা যায় যে, সবচেয়ে জুনিয়র এবং তুলনামূলক অসহায় নারী পুলিশ হওয়ায়, নারী কনস্টেবলরা জনগণ কর্তৃক সবচেয়ে কম সম্মানিত বোধ করেন।

সিনিয়র নারী পুলিশদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য উন্মোচিত হয়। বিশেষ করে তারা জানান যে, জনগণ পুরুষ পুলিশ সদস্যদের নারী পুলিশের তুলনায় অনেক বেশি রুঢ় এবং দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে করে।

"জনগণ আমাদেরকে পুরুষদের চেয়ে বেশি সম্মান করে।
পুরুষদের জন্যই পুলিশের ভাবমূর্তি খারাপ হয়"।
"জনগণ আমাদেরকে সম্মান করে, কারণ আমরা পুরুষ পুলিশদের মতো ঘুষ নেই না"।[47]

বিশেষ করে সিলেটে এই ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়েছে। উত্তরদাতারা বিশেষ করে জানান যে, জনগণ তাদেরকে পুরুষ সহকর্মিদের চেয়ে বেশি সম্মান করে, কারণ তারা ঘুষ আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করেন না। এই মতামত এই বিষয়ে অন্য দেশের মতামতের সাথে মিলে যাচ্ছে। অন্যান্য দেশেও দেখা গেছে যে, নারী পুলিশ সদস্যরা পুলিশ বিভাগের দুর্নীতির মাত্রা হ্রাস করতে দৃশ্যমান প্রভাব রেখেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, নারী পুলিশ সদস্যদের দুর্নীতির কলঙ্ক তুলনামূলক কম স্পর্শ করতে পেরেছে। আর তাই পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং পুলিশ বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পুলিশ বিভাগে আরও বেশিসংখ্যক নারী সদস্য নিয়োগ করা উচিত।

সবশেষে আমরা পুলিশ বিভাগে নারীদের সার্বিক অবস্থান এবং তাদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে নারী পুলিশদের মতামত জানতে চেয়েছিলাম।

46. ৭৩ জন মধ্যপর্যায়ের উত্তরদাতার মধ্যে ছয়জন এই প্রশ্নটির উত্তরটি শূন্য রাখেন। তাই এই পরিসংখ্যানটি সর্বমোট ৬৭ জনের জন্য প্রযোজ্য।

47. ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে গবেষকের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে এটাও সাথে বলা হয় যে, "জনগণ আমাদেরকে পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তাদের মতোই শ্রদ্ধা করে কিন্তু জনগণ আমাদেরকে ভয় পায় না"।

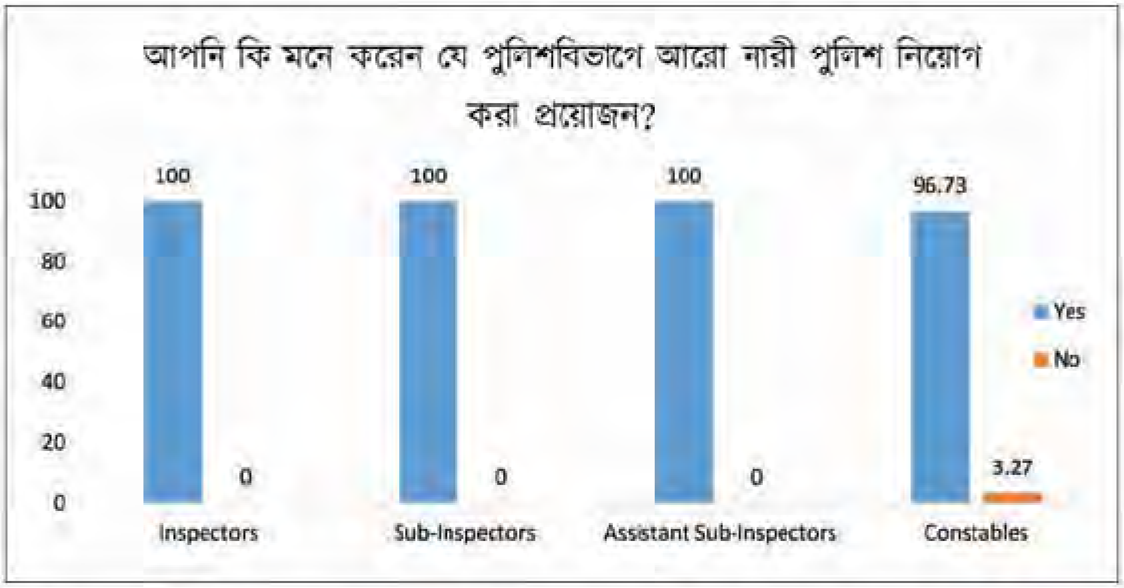

মধ্য-পর্যায়ের পদমর্যাদার ১০০% উত্তরদাতা[48] মনে করেন যে পুলিশ বিভাগে আরও বেশি নারী প্রয়োজন। ৯৬.৭৩% কনস্টেবল মনে করেন যে পুলিশ বিভাগে আরও নারী সদস্য প্রয়োজন। এই প্রশ্নে ১৫৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র পাঁচজনের উত্তর ছিল "না"। এই ফলাফল পিআরপি কর্তৃক পরিচালিত জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মিলে যাচ্ছে, যা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। ২০০৯ সালে পরিচালিত এধরনের প্রথম জরিপে ৯০% উত্তরদাতা/খানা (household) পুলিশ বিভাগে নারীদের বিষয়ে সমর্থন জানায় এবং ৪২% মনে করেন, পুলিশ বিভাগে অর্ধেকই নারী সদস্য হওয়া উচিত[49]। ২০১১ সালে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে, জনগণের একটি বিশাল অংশ (৯৩.৬%) মনে করে পুলিশ বিভাগে নারীদের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয়।

আমাদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এর সময় নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবিক ও ব্যবহারিক কারণসমূহই প্রাধান্য পায়, যেমন এর ফলে কর্মক্ষেত্রে অতিমাত্রার চাপ কিছুটা লাঘব হবে এবং তাদের কর্মঘন্টা কিছুটা শিথিল হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে এই অবকাশে কয়েকজন বলেন যে, যেসকল নারী পুলিশ বর্তমানে কর্মরত রয়েছে, তাদের পদোন্নতি হওয়া উচিত। এইদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, কর্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র বেশি সংখ্যক নারী সদস্য নিয়োগ করা খুব বেশি কার্যকর হবে না। এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ যা প্রাতিষ্ঠানিক কিছু বৈসাদৃশ্যকে তুলে ধরে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সকল বিষয় বিবেচনা না করে, নারীদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য শুধুমাত্র অধিক সংখ্যক নারী সদস্য নিয়োগ করার দিকে মনোনিবেশ করলে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষিত থেকে যায়। এটি মনে করিয়ে দেয় যে, পুলিশ বিভাগে নারীদের প্রকৃত অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সার্বিক দিক বিবেচনা করে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হবে।

২। নারীদের সাধারণ কর্ম অভিজ্ঞতা এবং সন্তুষ্টি

পুলিশ বিভাগে কর্মরত নারীদের দৈনন্দিন কর্ম-অভিজ্ঞতার বিস্তারিত চিত্র জানতে আমরা জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের তাদের প্রধান কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। একই সাথে কাজের কোন দিকটি তাদের সবচেয়ে পছন্দ এবং কী কী পরিবর্তন আনলে তাদের কর্ম-পরিস্থিতির সর্বাধিক উন্নতি হবে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম।

48. ৭৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে চারজন এই প্রশ্নটির উত্তরটি শূন্য রাখেন। তাই এই পরিসংখ্যানটি সর্বমোট ৬৯ জনের জন্য প্রযোজ্য।

49. Police Reform Programme (2009), "Police Reforms Programme-Public Attitude-Follow-up Survey Final Report", p 53, http://www.prp.org.bd/downloads/FollowupSurvey.pdf as on 25 November 2015

ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টররা তাদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে নিম্নলিখিত কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেন:

- দেশের মানুষের সেবা করা; আইনশৃঙ্খলা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা
- জীবন, সম্পদ এবং মানবাধিকার রক্ষা করা
- দরিদ্র, নারী ও শিশুসহ অসহায় মানুষের সেবা করা
- জনগণের সাথে পেশাদার আচরণ করা এবং দুর্নীতি পরিহার করা
- সংঘটিত ঘটনা তদন্ত করা, অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা করা এবং অপরাধীদের ন্যায়বিচারের আওতায় নিয়ে আসা
- ভিআইপিদের পাহারা দেয়া
- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আইনানুগ আদেশ অনুসরণ করা
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং অবৈধ সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়া

নারী কনস্টেবলরা উপরে উল্লিখিত অনেকগুলো কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহও তারা উল্লেখ করেন:

- থানায় জেনারেল ডায়েরি[50] লিপিবদ্ধ করা, অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গের জবানবন্দী গ্রহণ করা, রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করা।
- নির্বাচন, হরতাল, উৎসব এবং খেলাধুলাবিষয়ক অনুষ্ঠানে মাঠ-পর্যায়ের কর্তব্য পালন করা
- অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাহারা দেয়া এবং তাদেরকে আদালতে নিয়ে যাওয়া
- অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গকে সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে মেডিকেল পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া
- ধর্ষণের শিকার নারীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার[51] এ সহযোগিতা করা এবং থানার ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে[52] পারিবারিক সহিংসতা, অপহরণ, যৌন নির্যাতন, মানব পাচার এবং অন্যান্য অপরাধের শিকার নারী ও শিশুদের সহযোগিতা করা।

ইনস্পেক্টর, এসআই, এএসআই এবং কনস্টেবলদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারা তাদের চাকরির কোন তিনটি বিষয় সবচেয়ে পছন্দ করে। এই প্রশ্নের উত্তরে মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তারা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন: মামলার তদন্ত, মানুষের সেবা এবং ভিকটিমদের সহযোগিতা, পুলিশের পোশাক ও শৃঙ্খলা, চাকরির চ্যালেঞ্জ, দেশজুড়ে ভ্রমণ, জাতিসংঘের মিশনে যোগদান, কর্তব্য-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহও অনেকে উল্লেখ করেছেন:

- আকর্ষণীয় বেতন (বৈষম্যহীন)
- ভিকটিম এবং নির্যাতিত নারীকে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা

---

50. থানাগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্ট্রার সমূহের মধ্যে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) অন্যতম। এটি প্রতিটি থানার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংঘটিত অথবা সংঘটিতব্য সকল ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ করে।
51. ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওআইসিসি) গুলোতে যৌন অপরাধের শিকার ব্যক্তিবর্গকে তাদের প্রতিবন্ধকতা এবং ট্রমা/আঘাত লাঘব করতে চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা, মানসিক সহায়তা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। http://mspvaw.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=188&cmp=1&adfile=1&Itemid=143
52. ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার থানার অভ্যন্তরে কাজ করে এবং যৌন অপরাধ, অপহরণ, মানব-পাচার, পারিবারিক সহিংসতা, গৃহকর্মী নির্যাতনের মতো অপরাধের শিকার নারী ও শিশু এবং নিখোঁজ শিশুদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত এনজিওসমূহের মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল ও কার্যকরি সেবা দিয়ে থাকে। ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের তথ্যঃ http://www.prp.org.bd/menuvsc.htm

- পুরুষ কর্তৃক সমান মর্যাদা লাভ
- হারিয়ে যাওয়া শিশুকে তাদের পরিবারের কাছে ফেরত দেয়া
- স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ

এসকল তথ্য এই প্রতিবেদনে বর্ণিত কর্তব্য, ন্যায় এবং নিরাপত্তার প্রতি নারী পুলিশদের প্রত্যয়ের সাক্ষ্য বহন করে। নারীরা পুলিশ হিসেবে সমাজকে সেবা প্রদান করতে নিবেদিত। একইসাথে তারা সমতার আনয়ন ও তাদের নিজেদের স্বাধীনতা ও পেশাদারিত্বের প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কনস্টেবলদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহও এই একই মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে। পেশাদার কর্তব্যসমূহের মধ্যে নারীরা তদন্ত পরিচালনা করার সুযোগকে স্বাগত জানিয়েছেন; একজন উত্তরদাতা নির্দিষ্ট করে "অবৈধ মাদক আটক করা এবং অপরাধ দমন" এর কথা উল্লেখ করেন। একজন "বিপদের সময় মানুষের পাশে থাকা" এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন; আরেকজন নারী জানান যে, পুলিশ সদস্যরা "খুব কাছ থেকে [মানুষের জীবনের] বাস্তবতা দেখতে পারেন"।

পেশাগত জীবনে অগ্রসর হওয়ার বিষয়েও অংশগ্রহণকারীরা তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানান, যেমন "সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছ থেকে শেখা" এবং "লেখাপড়া করার সুযোগ" ইত্যাদি। অনেকেই পুলিশের চাকরির একটি দিকের কথা উল্লেখ করেন, তাহলো ভ্রমণের সুযোগ, যা তাদেরকে বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পরিচিতি পেতে সাহায্য করে। সবশেষে একাধিক নারী জানান যে, নারী এবং পুরুষের প্রতি সমান আচরণ এবং সমান ক্ষমতা প্রদান তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

নারীদের কর্তব্য এবং পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের অনুপ্রেরণা বিষয়ক প্রশ্ন করার পর আমরা উভয় পর্যায়ের নারী পুলিশ সদস্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কোন তিনটি বিষয় তাদেরকে তাদের কাজে আরও স্বচ্ছন্দ এবং দক্ষ করে তুলতে পারে।

ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পর্যায়ের নারীরা বেশ কয়েকটি উচ্চপর্যায়ের ও কিছু সুনির্দ্দিষ্ট সুপারিশ করেন, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

উক্ত নারীদের শনাক্তকৃত বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অনেকগুলোর উদ্দেশ্য হলো, পুলিশ বিভাগের নেতৃত্বের স্থানে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা। অংশগ্রহণকারীরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং পদোন্নতি বিষয়ক সুনির্দ্দিষ্ট প্রকাশিত বিধিমালা ও নির্ণায়কের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন[53]। একজন নারী সুপারিশ করেন যে, থানাগুলোতে ৩০% অফিসার-ইন-চার্জ নারী হওয়া উচিত। আরেকজন উত্তরদাতার সুপারিশ ছিল, প্রত্যেক থানাতে ন্যূনতম একজন নারী সাব-ইন্সপেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর এবং তিনজন নারী কনস্টেবল থাকা উচিত।

নারীদের পেশাগত উন্নয়নের জন্যেও কিছু সুপারিশ করা হয়। যেমন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরও অনেক বৈঠক এবং প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়। একজন অংশগ্রহণকারী প্রতিটি জেলার নারী পুলিশদের মধ্যে জ্ঞান ও মতামত আদান-প্রদানের জন্য একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রস্তাব জানান। অন্য নারীরা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নারী পুলিশ সদস্যদের সংবেদনশীল এবং জটিল মামলাসমূহে সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দেন।

নারীদের কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়। পরিবার জীবন বিষয়ে বেশ কয়েকজন অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্য দিবা-পরিচর্যা (ডে-কেয়ার) ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার

53. পদোন্নতি অবশ্যই অভ্যন্তরীণ বিধিমালা এবং নিয়মনীতিতে বর্ণীত কর্ম অভিজ্ঞতা, জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি পরীক্ষার ফলাফল, প্রশিক্ষণ সমাপন ইত্যাদির মানদণ্ডের ভিত্তিতে হতে হবে। এটি সম্ভবত ইঙ্গিত করে যে, পদোন্নতির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এতোই প্রকট হয়ে গেছে যে, নারী পুলিশ সদস্যদের কাছে প্রকৃত মানদণ্ডের চেয়ে সেটিকেই স্বাভাবিক চর্চা বলে মনে হয়।

কথা জানান। একজন নারী জানান যে "ঘন ঘন বদলি আমাদের শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে"। আরেকজন জানান, "যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পুলিশে চাকরি করে তবে একই স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য আরও বেশি প্রয়াস নেয়া উচিত"। একইভাবে আরেকজন নারী তাদের কর্মঘন্টা আট ঘন্টার মধ্যে সীমিত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কাঠামোগত দিক থেকে নারীরা বার বার পৃথক শৌচাগার, বিশ্রাম কক্ষ এবং প্রার্থনা কক্ষের প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করেন। একজন নারী উন্নত চিকিৎসা সুবিধার কথা উল্লেখ করেন। আরেকজন ব্যায়ামাগার এবং খেলাধুলার সুব্যবস্থার উপকারিতার ওপর জোর দেন। এছাড়াও অনেকে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

পেশাগত জীবনের উন্নয়নের জন্য কনস্টেবলরা এসকল অগ্রাধিকারের কথা জানান, যা তাদের পারিবারিক জীবন কর্মজীবন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে ছিল সকল সদস্যের জন্য গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সেবা প্রশিক্ষণ এবং কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

নারীরা তাদেরকে তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ওপর জোর দেন। একজন অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে জানান যে, ছোট ইউনিটে যারা কাজ করছেন তারা বড় ইউনিটে কর্মরত সদস্যদের সমান সুযোগ পান না। এই বিষয়ে তাদের মত হচ্ছে, পৃথক আবাসন ব্যবস্থা না থাকার কারণে অথবা আরও উদ্বেগজনকভাবে পদোন্নতি ও পোস্টিং এর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের জন্য নারীরা বড় ইউনিটে পোস্টিং পান না। নারীদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য এসকল বিষয়কে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

সমাধানের লক্ষ্যে

নারী পুলিশ সদস্যদের নিজেদের শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের জন্য যেসকল প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তার একটি তালিকা এসকল উত্তর থেকেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে, শিশুদের জন্য দিবা-পরিচর্যা কেন্দ্র, প্রত্যেক থানাতে নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও বিশ্রামাগার, গাড়ি চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, খেলাধুলার ব্যবস্থা ইত্যাদি। বিভিন্ন পদমর্যাদার সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত উন্মুক্ত সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে পুলিশের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা যায়। এর মাধ্যমে কর্ম-পরিস্থিতি বিষয়ে মতবিনিময় করা যায় এবং সমাধান প্রস্তাব করা যায়।

কনস্টেবল পদমর্যাদার নারী পুলিশ সদস্যদের দেওয়া উত্তরের সাথে মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দেওয়া উত্তরের মধ্যে বেশ কিছু পুনরাবৃত্তিমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। বেশ কয়েকজন নারী কনস্টেবল সিনিয়র কর্মকর্তা এবং পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে "ভাল ব্যবহার" এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে নারী কনস্টেবলরা তাদের পদমর্যাদার কারণে পুরুষ সহকর্মিদের চেয়ে কম সম্মান পান। অন্যান্য কিছু প্রশ্নের উত্তরেও এরকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বনিকৃষ্ট ক্ষেত্রে এটি যৌন হয়রানির নামান্তর মাত্র। এধরনের উদ্বেগ প্রকাশের পুনরাবৃত্তি ইঙ্গিত করে যে পুলিশ সদর দপ্তরের এই সমস্যার বিষয়ে আরও তদন্ত করা উচিত এবং এর সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

নারী পুলিশ সদস্যদের তাদের চাকরির অভিজ্ঞতার সবচেয়ে ভাল দিকগুলো এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর আমরা তাদের আরেকটি বিষয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ করি, আর তাহলো, বর্তমান সময়ে পুলিশ বিভাগ নারীদের কাজ করার জন্য একটি উত্তম স্থান কিনা!

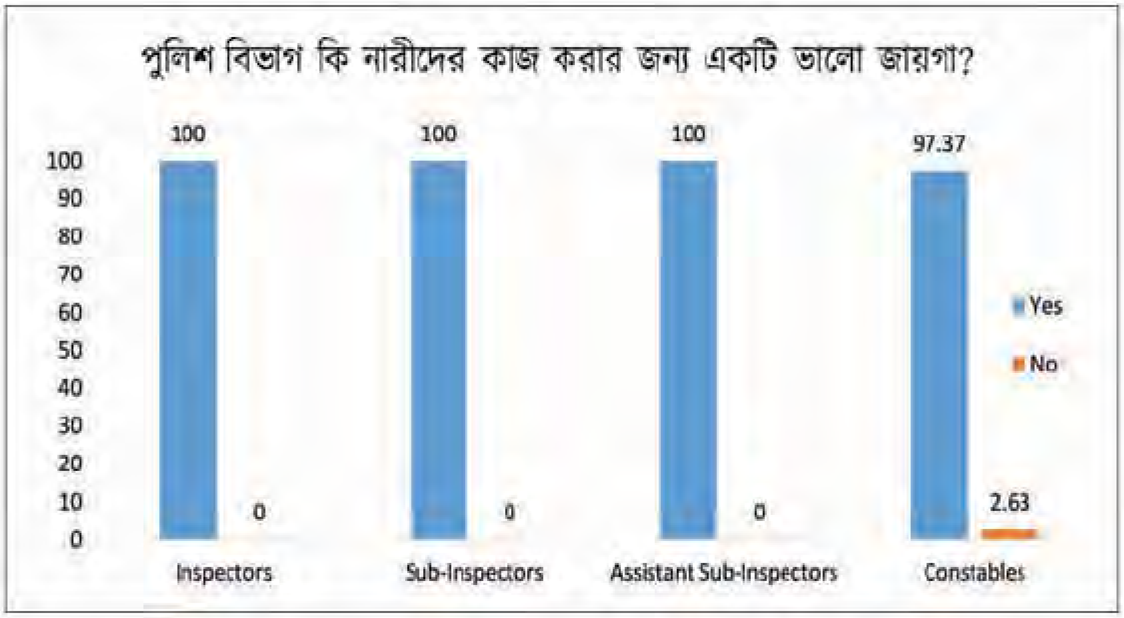

মধ্য পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা[54] জানান, পুলিশ বিভাগ কাজ করার জন্য একটি উত্তম স্থান। তাদের শনাক্তকৃত কিছু সমস্যা সত্ত্বেও নারীরা পুলিশ বিভাগকে পছন্দ করেন এবং মনে করেন যে এটি অন্য নারীদের জন্যেও একটি উত্তম কর্মক্ষেত্র। একইভাবে কনস্টেবলদের অধিকাংশই (১৫২ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪৮ জন/৯৭.৩৭%) মনে করেন, পুলিশ বিভাগ একটি উত্তম কর্মক্ষেত্র।

তবে ঢাকায় আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী পুলিশ বিভাগকে একটি উত্তম কর্মক্ষেত্র হিসেবে মনে করলেও, স্বল্পসংখ্যক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে এ নিয়ে দ্বিধান্বিত দেখা যায়। তারা জানান, পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের সময় তাদের যেসকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তা বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। কিন্তু তারা এই ব্যবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন। তবে তারা এও বলেছেন যে, তারা আরও বেশিসংখ্যক নারীকে পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করবেন, কারণ এটি এমন একটি চাকরি যেখানে নারীদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

যদিও নারী কর্মকর্তাগণ সার্বিকভাবে পুলিশ বাহিনীতে নারীদের কর্ম-পরিবেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন, তথাপি আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তরে এর কিছুটা তারতম্য দেখা গেছে। যেখানে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা তুলে ধরেছেন। যেমন সিলেটের কনস্টেবলদের সাথে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তারা কি তাদের কন্যাসন্তানকে পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করবেন কিনা। অনেকেই এক্ষেত্রে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং বলেন যে, তারা তাদের কন্যাসন্তানকে উচ্চপদে যোগদান করার জন্য পরামর্শ দেবেন।

এসবকিছু বিবেচনা করলে, এই তথ্য এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নারীরা পুলিশ বিভাগে প্রকৃতপক্ষেই অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। বৃহত্তর পর্যায়ে এসকল বিষয়ে সরকার এবং পুলিশ বিভাগের নেতৃত্ব পর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে এসকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারী পুলিশ সদস্যরা অন্য নারীদের পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেন। এছাড়াও বিভিন্ন পদমর্যাদার নারীদের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেহেতু পুলিশ বাহিনীতে নারীর যোগদান অব্যাহত থাকবে, সেহেতু পুলিশ বিভাগের উচিত নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-

54. ৭৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে একজন এই প্রশ্নটির উত্তরটি শূন্য রাখেন।

সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, যাতে তারা পুলিশ বিভাগকে তাদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করতে পারে এবং এর বিনিময়ে তাদের নিজেদের পারিবারিক জীবন এবং কর্ম জীবনের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। পুলিশ বিভাগ, বিশেষ করে নেতৃত্ব পর্যায় এবং উচ্চপদস্থ নারী পুলিশদের অবশ্যই এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে সকল পদমর্যাদার নারীরা, বিশেষ করে কনস্টেবলরা, তাদের সিনিয়র ও জুনিয়র পুরুষ সহকর্মীদের থেকে প্রাপ্য মর্যাদা পান এবং তাদের পুরুষ সহকর্মিদের মতই নতুন কিছু শেখা এবং পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ পান।

৩। কর্মজীবন এবং পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের চ্যালেঞ্জ

তিনটি জেলার কনস্টেবল, ইনস্পেক্টর, সাব- ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব- ইনস্পেক্টরদের দেয়া তথ্য মতে, কর্মঘন্টা প্রায় কখনই আট ঘন্টার মধ্যে সীমিত থাকে না। সাধারণত কাজের শিফটগুলো ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। অংশগ্রহণকারীরা বার বার এটিকে নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, বিশেষত যাদের পারিবারিক দায়িত্ব রয়েছে তাদের জন্য। ক্যাডার পর্যায়ের একজন অফিসার উত্তরদাতা জোর দিয়ে বলেন যে, এই বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যার জন্য নারীরা পুলিশের চাকরিতে যোগদান করতে নিরুৎসাহিত হন। এছাড়া দীর্ঘ সময় দুরূহ পরিস্থিতিতে কাজ করার শারীরিক ধকলের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

একই সাথে, কিছু উত্তরদাতা মনে করেন যে, এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মাধ্যমেই নারীরা নিজেদেরকে প্রমাণ করতে পারবে। একজন সিনিয়র নারী সদস্য বলেন,

"আমরা কনস্টেবলদের কাছে প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে, তাদের এটি করতে সক্ষম হওয়া উচিত। কনস্টেবলরা তাদের সন্তান-ধারনের বয়সে পুলিশ যোগদান করে। চাকরি জীবনের শুরুতে তাদেরকে পারিবারিক জীবন এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক চাপ সহ্য করতে হয়। আমি তাদেরকে মানিয়ে চলতে বলি এবং নিজেদেরকে প্রমাণ করতে বলি। নারীরা পরিবারের দেখাশোনা করবে, এটি এশিয়া মহাদেশের একটি ধারণা। আমাদেরকে আমাদের জীবনের আরাম ত্যাগ করতে হবে"।

তবে সিনিয়র কর্মকর্তাদের উচিৎ প্রাতিষ্ঠানিক পক্ষপাতিত্বের বিরোধিতা করার দায় থেকে নারীদের রক্ষা করা। অন্যথায় পুলিশ বাহিনীতে নারীদের একীভূতকরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে বিপিডব্লিউএন একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, যাতে নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য তাদেরকে বারংবার নিজেদের প্রমাণ করতে না হয়।

পারিবারিক ও পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন নারী পুলিশদের জন্য একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও কনস্টেবলদের সাথে পরিচালিত আমাদের জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেমন নারীরা কত ঘণ্টা কাজ করছেন এবং এটি তাদের ওপর কীরকম প্রভাব ফেলে।

জরিপে পাওয়া যায় যে, ৫০% ইনস্পেক্টর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করেন এবং এছাড়াও আরও ৩৩.৩৪% নারী ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কাজ করেন। সাব-ইনস্পেক্টরদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬২.১৬%) দিনে ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় কাজ করেন। এএসআই পর্যায়ের ৪০% দিনে ১২ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন এবং আরও ২৬.৬৭% ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করেন। কনস্টেবল পর্যায়ের ৪৩.৮% নারী ১২ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন এবং আরও ১৮.৩% দিনে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করেন।

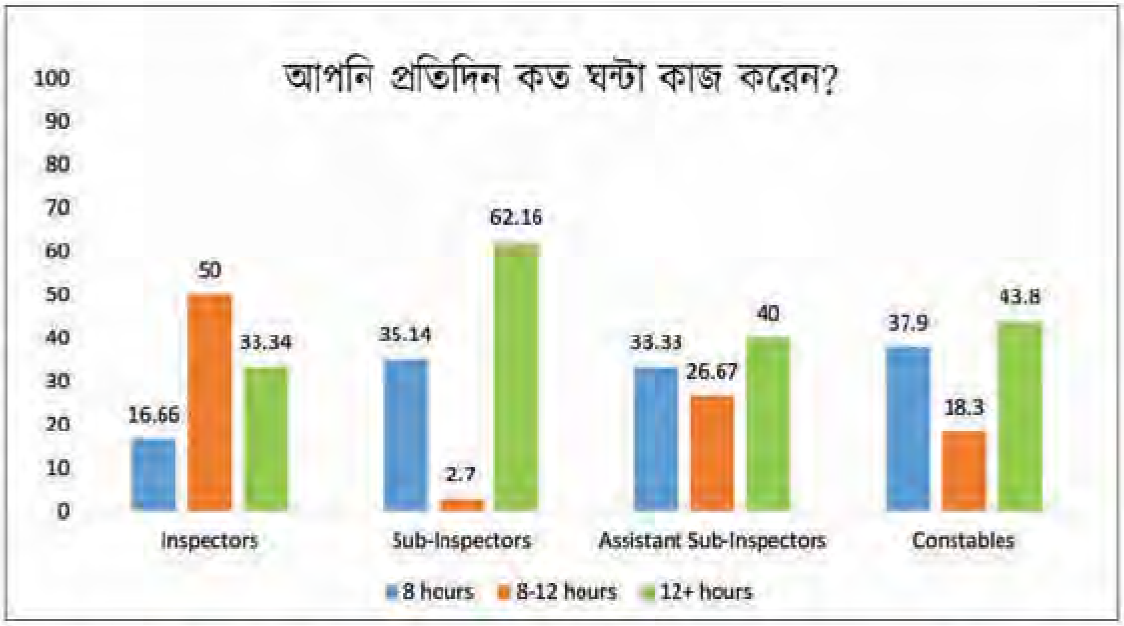

বিভিন্ন পদমর্যাদার নারীদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এর কারণ সম্ভবত বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের নারীদের বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা। সকল পদমর্যাদার মধ্যে সিলেটের বেশিরভাগ নারী দিনে আট ঘন্টা কাজ করেন বলে জানা যায়[55]। সেই তুলনায় ঢাকার বেশিরভাগ কর্মকর্তা দিনে ১২ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করেন এবং চট্টগ্রামের অধিকাংশ নারী পুলিশ ১২+ এবং ৮-১২ ঘন্টা কাজ করেন। যেহেতু এসকল স্থানে অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে বাইরে থেকে আসা কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন, সেহেতু কোনও সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছানো কঠিন। তবুও কর্মঘন্টা সংক্রান্ত বিরাজমান এরকম পার্থক্য ইঙ্গিত করে যে, পুলিশ বিভাগের এই বিষয়টি আরও নিবিড়ভাবে বিবেচনা করা উচিৎ।

তবে সামগ্রিক[56] তথ্যের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পদমর্যাদার তিন-পঞ্চমাংশেরও বেশি নারী দিনে আট ঘন্টার বেশি সময় কাজ করেন বলে জানিয়েছেন। সামাজিকভাবে নারীদের মূলত পরিবারের যত্ন নেয়ার ভূমিকা পালনে আশা করা হয়। নারী পুলিশ সদস্যরা পরিবার ও কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবেন, এরকম আশা করা হলেও, তাদের পুরুষ সহকর্মিদের কাছে এমনটি আশা করা হয় না। তবুও এই তথ্যের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীরা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছে।

নারী পুলিশ এবং পুরুষ পুলিশ উভয়ের জন্যই দীর্ঘ সময় কাজ করা একটি সমস্যা। প্রশ্নাতীতভাবেই সকল পুলিশ সদস্যের জন্যই এর সমাধান হওয়া উচিৎ, বিশেষ করে থানা পর্যায়ের সদস্যদের জন্য। কিন্তু এই সমস্যার জন্য নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই বিষয়টিকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

এর একটি মৌলিক সমাধান হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কর্মঘন্টা অনুসারে একটি শিফট ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যা বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে নেই[57]। যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমেও দৈনন্দিন কর্মঘন্টার পরিসর অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার নারী পুলিশ সদস্যদের মধ্যে কর্মঘন্টার পার্থক্য চিহ্নিতকরনের মধ্যমে আরও একটি তথ্য

55. সিলেটে অংশগ্রহণকারী এএসআই'দের এক-তৃতীয়াংশ বা ৩৩.৩৩% জানান তারা দৈনিক ৮ ঘন্টাপর্যন্ত কাজ করেন।

56. পদমর্যাদা অনুসারে সকল রেঞ্জ

57. আসলে, এটি এই অঞ্চলের একটি সাধারণ চিত্র। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের পুলিশ সংস্থায় কোনও আনুষ্ঠানিক শিফট বা কর্মঘন্টা (যেমন ৮ ঘন্টার শিফট) নেই। এটি পুলিশের সেবার গুণগত মান এবং পুলিশ সদস্যদের কর্মজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উন্মোচিত হয়। কম জনবলের কারণে যেসকল স্থানে পুলিশ সদস্যদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হচ্ছে সেসকল স্থানে সদস্যদের ওপর চাপ কমাতে পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অধিকসংখ্যক জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে। আরও বিস্তারিত জরিপের মাধ্যমে পুলিশ বিভাগ নিজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যা তাদেরকে সম্পদের সুষম বণ্টন এবং কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

ফলো-আপ প্রশ্ন হিসেবে মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কনস্টেবলদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো: "সবসময় ডিউটিতে থাকা কি কঠিন"? এই প্রশ্নের উৎস হলো ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের ধারা ২২, যেখানে বলা হয়েছে যে, "সকল পুলিশ অফিসার সর্বদা কর্তব্যরত আছেন বলে বিবেচনা করা হবে"। এই উপনিবেশিক আইনগত কাঠামোতে কোনও পরিবর্তন না আসায় এবং শিফট ব্যবস্থা প্রচলন না হওয়ায়, পুলিশ কর্মকর্তাদের কর্মঘন্টা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে কোনও কাঠামো নেই। এর ফলে টানা কাজ করার একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়, যা নারী পুলিশ সদস্যদের পারিবারিক জীবন এবং কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সামগ্রিক তথ্যে ৮৩.৩% ইনস্পেক্টর এবং ৫৯.৫% সাব-ইনস্পেক্টর এর মতে, সবসময় কর্তব্যরত থাকা বেশ কঠিন। তবে ৫৮.৬% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইনস্পেক্টর জানান, তাদের কাছে এটি কঠিন মনে হয় না। ঢাকার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে ১০০% ইনস্পেক্টর, ৮৪.৬% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৬৬.৭% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর মনে করেন, সবসময় কর্তব্যরত থাকা বেশ কঠিন। উল্লেখ্য, এই জেলার সকল পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের অধিকাংশ জানিয়েছিলেন যে, তারা প্রতি শিফটে ১২ ঘণ্টার বেশি সময় কর্তব্য পালন করেন।

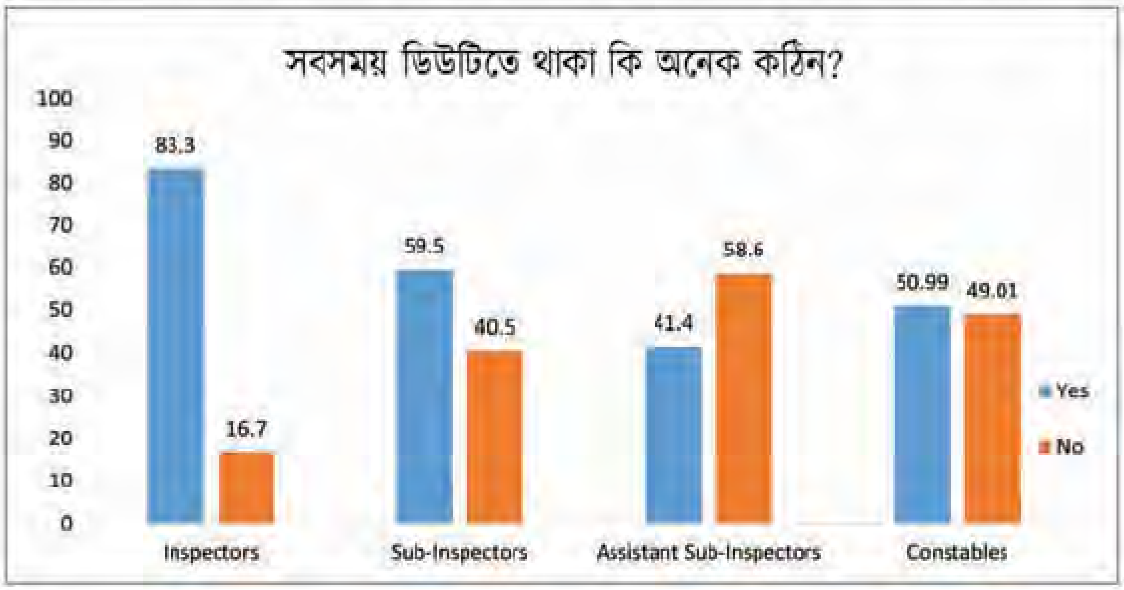

যদিও জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫০.৯৯% কনস্টেবল মনে করেন যে সবসময় কর্তব্যরত থাকা কঠিন, তারপরও ৪৯.০১% কিন্তু মনে করেন যে, এটি কঠিন নয়। ঢাকাতে ৭৬.৫৬% এবং চট্টগ্রামে ৬৮.৭৫% কনস্টেবল মনে করেন যে এটি কঠিন। শুধুমাত্র সিলেটের ৮৯.০৯% মনে করেন যে, সবসময় কর্তব্যরত থাকা কঠিন কিছু নয়। সিলেট, চট্টগ্রাম এবং ঢাকার কনস্টেবলদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এতোটা পার্থক্য হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, সিলেটের কনস্টেবলরা দিনে আট ঘণ্টা করে কাজ করেন বলে জানিয়েছিলেন, আর ঢাকা ও চট্টগ্রামের কনস্টেবলরা জানিয়েছিলেন যে, তারা দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন।

এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, দীর্ঘ সময় কাজ করতে হলে এবং মাঝে মাঝেই অনির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করতে হলে নারী পুলিশ সদস্যদের পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কষ্টকর হয়ে

ওঠে। এই সংগ্রাম আরও দুরূহ হয়ে ওঠে পর্যাপ্ত শৌচাগার, বিশ্রাম/প্রার্থনা কক্ষ, যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত কারণে এবং সহযোগিতা করার মত নারী সহকর্মির সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে।

এই প্রশ্নের উত্তরে যেসকল অংশগ্রহণকারীরা "না" বলেছিলেন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং সাক্ষাৎকার সমূহে তাদের সেই উত্তরের কারণগুলো উঠে আসে। যেমন ঢাকার কনস্টেবলরা বলেছেন, যদিও প্রথমদিকে এরকম কর্মঘন্টার সাথে সাথে মানিয়ে নেয়া কঠিন ছিল, কিন্তু এখন তারা এটিকে জীবনের একটি অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এছাড়াও আমাদেরকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এমন অনেক ক্যাডার পর্যায়ের কর্মকর্তা পুলিশ হিসেবে সর্বদা প্রস্তুত থাকার সংস্কৃতির কথা বলেছেন। একজন নারী বলেন, "পুলিশরা সপ্তাহের ৭ দিনই ২৪ ঘণ্টা কর্তব্যরত থাকেন"।

কাজের শিফট বিষয়ক সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে এ ব্যাপারে নারী পুলিশ সদস্যদের ধারণা জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা তাদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম সকল পুলিশেরই শিথিল-যোগ্য কর্মঘন্টা থাকা উচিৎ কিনা। সকল পুলিশ সদস্যের জন্য শিফট ব্যবস্থায় সার্বিক পরিবর্তন আনার চাইতে নারীদের কর্ম/পারিবারিক জীবনে কার্যকরি ভারসাম্য বজায় রাখতে নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য শিথিল-যোগ্য শিফট ব্যবস্থা প্রণয়নের বিষয়ে সমর্থনের মাত্রা নিরূপণ করতে চেয়েছিলাম আমরা।

এক্ষেত্রে, সকল পদমর্যাদার উত্তরদাতাদের অধিকাংশই মনে করেন যে সকল পুলিশ সদস্যদেরই কর্মঘন্টা শিথিল করে দেওয়া উচিৎ। এর অর্থ হলো, নারী পুলিশরাও উপলব্ধি করেন যে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যেই শিথিল কর্মঘন্টা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা পুলিশ বিভাগে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারেন।

আট-ঘণ্টা শিফট ব্যবস্থা: ভারত থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহ

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যরা সাধারণত দিনে ১২ ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশি সময় কাজ করেন। ভারতের পুলিশও একই সমস্যায় জর্জরিত। সেদেশের কিছু রাজ্যের পুলিশ বিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে অনানুষ্ঠানিক শিফট ব্যবস্থা প্রচলন করেছে। থানাতে কর্মরত নির্দ্দিষ্ট কিছু পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যের জন্য আট ঘন্টার ডিউটি ব্যবস্থা প্রচলন করার কথা পুলিশ সংস্কার উদ্যোগে অসংখ্যবার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও অবধি কোথাও একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্মব্যবস্থা

পরিকল্পনা/বাস্তবায়িত করা হয়নি। ২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার "থানাতে ৮ ঘণ্টার শিফট ব্যবস্থা প্রচলনের জাতীয় প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করে। এই গবেষণা পত্রে থানাতে কর্মরত কিছু পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের জন্য আট ঘণ্টার শিফট ব্যবস্থা এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি জন্য একটি বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা প্রদান করে। এই গবেষণায় স্বীকার করে নেয়া হয় যে, এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ বিভাগে বিদ্যমান জনবলের প্রচণ্ড অভাবের কথা বিবেচনা করতে হবে। আর তাই এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় পুলিশ সদস্যের সংখ্যাও হিসেব করে বের করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছিল যে, এই প্রয়োজনীয় সংখ্যাটি শুধুমাত্র নারী পুলিশ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা উচিৎ, যাতে পুলিশ বিভাগে আরও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একইসাথে যেমন পুলিশ বিভাগে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা যাবে[58], তেমনি শিফট ব্যবস্থাও প্রচলন করা যাবে। বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ তাদের নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে পারে।

এই পর্বের সর্বশেষ প্রশ্নে কনস্টেবলদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা কি মাঠ পর্যায়ের কাজ পছন্দ করেন, নাকি টেবিল-চেয়ারে বসে যে সকল কাজ করা যায় সেই কাজগুলো পছন্দ করেন[59]। বিপিডব্লিউএন এর সাথে আলোচনায় আমার জানতে পারি যে, পুরুষ কর্মকর্তা সবসময় অভিযোগ করেন নারীরা শুধু "সহজ" কাজ করতে চান। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনেও এধরনের অভিযোগের কথা শোনা যায়।

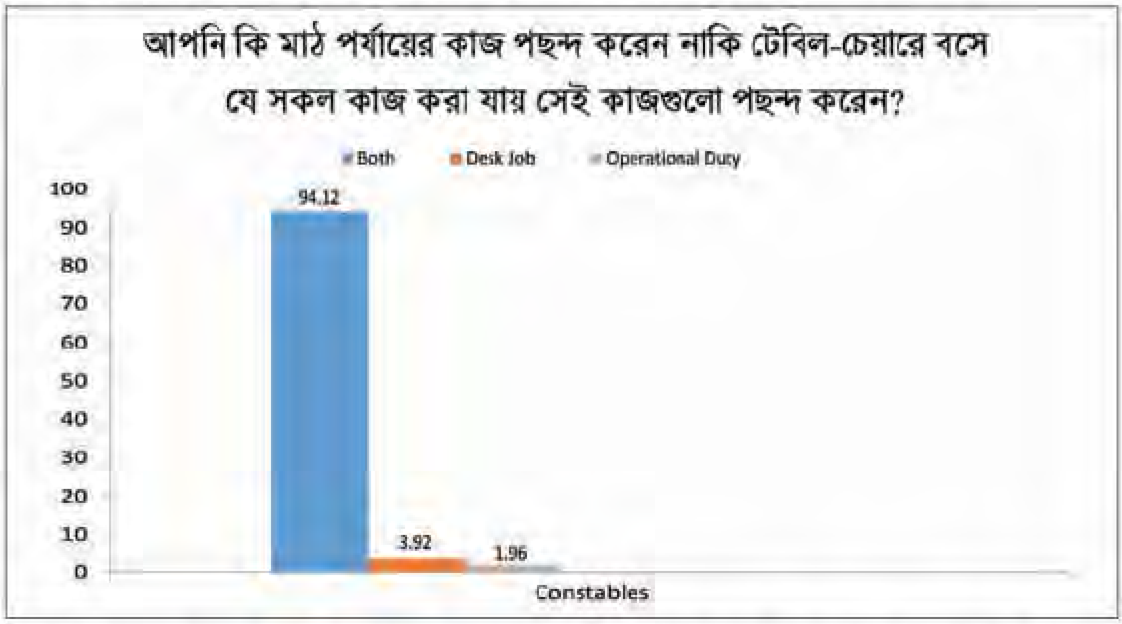

জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে বেশিরভাগ কনস্টেবল, মাঠ পর্যায়ের কাজ এবং টেবিল-চেয়ারে বসে করা যায় এমন দুই ধরনের কাজই করতে চান। কাজেই সাধারণ প্রচলিত ধারণার বিপরীতে, দেখা যাচ্ছে যে, জুনিয়র পদের পুলিশ সদস্যরা তাদের কাজে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চান।

---

58. Government of India, Bureau of Police Research and Development (2014), Sponsored study on National Requirement of Manpower for 8-Hour Shifts in Police Stations, p. 127-128, http://bprd.nic.in/writereaddata/linkimages/5122897254-National%20Requirement%20of%20Manpower%20for%208%20Hour%20Shifts%20in%20Police%20Stations.pdf as on 25 November 2015

59. ক্যাডার কর্মকর্তা বা মধ্য পর্যায়ের সদস্যদের কর্তব্য নির্ধারিত এবং কাঠামোভুক্ত। তবে কনস্টেবলদেরকে বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং মাঠ পর্যায়ের কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে ঢাকা এবং সিলেটের অংশগ্রহণকারীরা জানান, টেবিল-চেয়ারে বসে কাজ করলে তাদের কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হয়, কারণ তারা এতে কম ক্লান্ত বোধ করেন। তবে যদি শিফট এর দৈর্ঘ্য আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো তবে হয়তো মাঠ পর্যায়ের ডিউটি আরও ভালোভাবে সম্পাদন করা যেত।

পরিশেষে, এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে নারীরা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজে সীমাবদ্ধ থাকতে চান না। তারা চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বও পালন করতে চান। প্রকৃতপক্ষেই আমাদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং জরিপের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কর্তব্য, ন্যায়বিচার, পেশাদারিত্ব এবং নিজেদেরকে প্রমাণ করার ব্যাপারে তাদের একাগ্রতা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু নারীদের জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো এবং সুবিধার অভাবে তারা তাদের যোগ্যতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারছে না। তারপরেও তারা হয়তো কখনও কখনও টেবিল-চেয়ারে বসা কাজ করতে পছন্দ করবেন, কারণ অন্যথায় তারা কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবনের দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারেন না।

নারীদের পেশাগত উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাত কতটুকু প্রভাব রাখে?

প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মাঠ-পর্যায়ের নেতৃত্বমূলক পদসমূহে নারীদেরকে দায়িত্ব না দেয়ার বিষয়ে নারীরা বারংবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যা বেশ আশংকাজনক। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে মাত্র একটি জেলার পুলিশের প্রধান পদে একজন নারী নিয়োজিত আছেন। এই বাস্তব চিত্রে তাদের উদ্বেগের কারণটি প্রতিফলিত হয়। তবে আমরা যেসকল ক্যাডার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাদের মতে উক্ত জেলাটি বেশ দূরবর্তী এবং তুলনামূলক কম অপরাধ-প্রবণ বলে এটিকে একটি সহজ কর্মক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে এমন একজনও নারী পুলিশ কর্মকর্তা নেই যিনি একটি থানার প্রধান[60] কর্মকর্তা।

বৃহত্তর পর্যায়ে নারী পুলিশ সদস্যদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব কতটুকু প্রভাব রাখছে তা নিরূপণ করার জন্যে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের কিছু আন্তরিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা উচিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর কিছু উদ্বেগজনক উপসর্গ দেখা গিয়েছে। অনেকেই এরকম বেশ কিছু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। একজন সিনিয়র নারী পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, "কর্তৃপক্ষ অনেক সময় পক্ষপাত করে থাকেন, এবং তারা তাদের পছন্দের লোক কে সকল ভালো কর্মক্ষেত্রগুলোর দায়িত্ব প্রদান করেন"। আরেকজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, যখন তিনি ট্রাফিক ইউনিটে (যে ইউনিটটি যে কারো জন্য সবচেয়ে কঠিন) যোগদান করতে চান, তখন তার এই কঠিন দায়িত্বগ্রহণ করতে চাওয়ার আগ্রহকে স্বীকৃতি না দিয়ে তার সিনিয়র কর্মকর্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই বলে যে, এটা করলে "তিনি রোদে কালো হয়ে যেতে পারেন"।

আরেকটি উদাহরণে, আমরা জানতে পারি যে নারীদেরকে কনস্টেবল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টর এর মধ্যবর্তী পদ "নায়েক" পদে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশ পুলিশের নায়েক পদে কোনও নারী নেই। নারী কনস্টেবলদেরকে সরাসরি এএসআই পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে যে, নায়েকরা বাহিনী ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন এবং মাঠ-পর্যায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত টিমগুলোর নেতৃত্ব দেন এবং নারীদেরকে এরকম দায়িত্ব দেওয়া হয় না[61]। পুরুষদের মতো নারীরাও পুলিশ ব্যবস্থার যেকোনো দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে, এই মূলনীতির ওপর দাঁড়িয়ে নারীদেরকে নায়েক পদে নিয়োগ না দেয়ার সমর্থনে কোনও যুক্তি প্রদান করা বেশ কষ্টসাধ্য।

60. ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে শামীমা বেগম একটি ইমেইলের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে এই তথ্য প্রদান করেন।

61. ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে বিপিডব্লিউএন কর্মীর সাথে একটি ই-মেইল যোগাযোগের মাধ্যমে এই ধারণা পাওয়া যায়।

এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, যদিও নারীদের সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে না চাওয়ার অভিযোগ করা হয়, তবুও যে সকল নারী মাঠ পর্যায়ের কাজ করতে আগ্রহী হন তাদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মক্ষেত্রে মোতায়েন করা হয় না। তবে উৎসাহ-জনক বিষয় হচ্ছে যে, খসড়া জেন্ডার নীতিমালায় সুনির্দ্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদেরকে মাঠ-পর্যায়ের এবং অপারেশনাল কর্মক্ষেত্রে মোতায়েন করার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নারীরা যাতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পায় তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৪। সুযোগ-সুবিধা এবং সেবাসমূহ

কর্মক্ষেত্রে নারীদেরকে সমানভাবে সক্ষম করে তোলার মূল উপায় হলো প্রয়োজনীয় নীতিমালা এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, যাতে তারা মর্যাদার সাথে কাজ করতে পারেন এবং কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব সমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন।

নারী পুলিশ কর্মকর্তারা বেশ কিছু অবকাঠামোগত বিষয় বারংবার সনাক্ত করেছেন, যেমন পৃথক টয়লেট, বিশ্রামাগার এবং পোশাক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষের অভাব, ইত্যাদি। এছাড়াও নারীদের জন্য আবাসন অথবা ব্যারাক এর প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদেরকে নির্দ্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে সক্ষম করে তুলবে।

নিঃসন্দেহে এসকল প্রয়োজন পূরণের ব্যয় বহন করার জন্য আর্থিক যোগান একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে অংশগ্রহণকারীরা বলেন যে, এটি বিদ্যমান সমস্যার শুধুমাত্র একটি দিক। একজন সিনিয়র জানান যে বাজেট সংক্রান্ত বিলম্বের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তাই আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে বাজেট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

"সরকারের যা করতে হবে তাহলো, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর জন্য বাজেট বৃদ্ধি করা। কখনও কখনও বাজেট এতো দেরিতে আসে যে অর্থ-বছর শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য বাজেট ফেরত পাঠাতে হয়"।

সুযোগ-সুবিধা ও সেবা বিষয়ে নারীরা যে সকল আর্থিক ও নীতিগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন সেই বিষয়ক আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রথম প্রশ্নটি ছিল, নারী সদস্যদের সহযোগিতার জন্য পুলিশ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সম্পর্কে নারীরা অবগত আছেন কীনা!

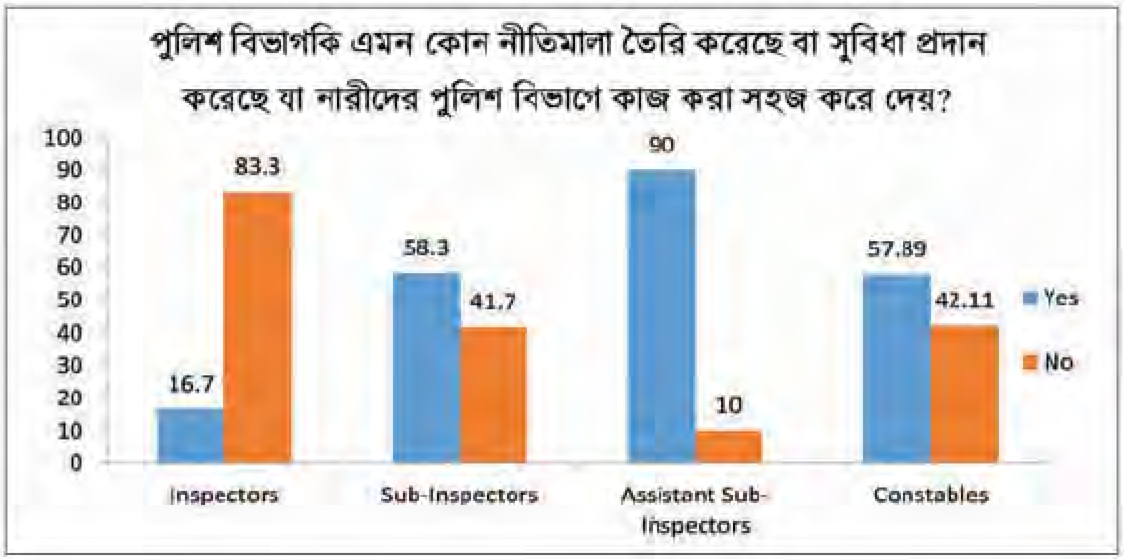

মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সুনির্দ্দিষ্ট করে বলেন:

- বিপিডব্লিউএন
- খাদ্য ও ব্যারাক
- কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে সিনিয়র অফিসারদের সহযোগিতা
- মাতৃত্বকালীন ছুটি
- স্বামী-স্ত্রীর একই স্থানে কর্মক্ষেত্র স্থাপন
- চাকরির সাথে সাথে লেখাপড়া চলমান রাখা

অন্যেরা বলেন, তারা শুনেছেন যে নীতিমালা প্রস্তুত করা হচ্ছে, তবে তাদেরকে সুনির্দ্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।

কনস্টেবলরা যোগ করেন:

- সহযোগিতার এবং প্রশিক্ষণের জন্য বিপিডব্লিউএন
- খাদ্য এবং আবাসনের সুবিধা
- কেউ কেউ সুবিধা হিসেবে পুলিশের জন্য মর্যাদার কথা উল্লেখ করেন
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভ্রমণ
- মাতৃত্বকালীন সুবিধা
- যৌন হয়রানি বিষয়ক নীতিমালা

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ৫৮.৩% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৯০% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর জানান যে, নারী পুলিশ সদস্যদের সহযোগিতা করার জন্য কিছু সুবিধা এবং নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। তবে ৮৩.৩% (প্রতি ছয়জনের পাঁচজন) এর উত্তরে "না" বলেছেন। ৫৭.১৪% নারী কনস্টেবল মন করেন যে, পুলিশ বাহিনীতে নারীদের কাজের সুবিধার জন্য পুলিশ বিভাগ নীতিমালা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রণয়ন করেছে, তবে ৪২.৮৬% এমনটি মনে করেন না। চট্টগ্রামের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, কর্তব্যরত অবস্থায় তাদের শিশুদের জন্য দিবা পরিচর্যা-কেন্দ্র, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার জন্য পরিবহন এবং আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রচলন করা প্রয়োজন।

উন্মুক্ত প্রশ্নের উত্তরসমূহে দেখা যায় যে, বেশ কয়েকটি নীতিমালা এবং সুযোগ-সুবিধা নারীদের কাছে সহায়ক মনে হয়েছে। যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটি[62] এবং বিপিডব্লিউএন শুধু নারীদের জন্য, যেখানে খাদ্য এবং ব্যারাকের বিষয়টি সব পুলিশ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। তাই যখন কেউ "হ্যাঁ" উত্তর দিয়েছেন, তখন তার কারণ হয়তো এই ছিল যে, অন্তত কিছু নীতিমালা রয়েছে যা নারীদের জন্য সহায়ক। যারা "না" উত্তর দিয়েছেন, তারা হয়তো মনে করেছেন যে বিদ্যমান নীতিমালা এবং সুযোগ-সুবিধা সমূহ পর্যাপ্ত নয় অথবা তা আরও কার্যকরি হতে পারে।

বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যের মধ্যে মতামতের পার্থক্যের কারণটি বলা বেশ কষ্টসাধ্য। তবে বেশিরভাগ এএসআই'দের উত্তর "হ্যাঁ" হওয়ার পেছনে একটি কারণ এমন হতে পারে যে তারা মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে জুনিয়র পদমর্যাদার। তাই তারা হয়তো পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক মন্তব্য করতে চান না। অথবা যেহেতু তারা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত, তারা হয়তো জানেন না তাদের সহায়তার জন্য কী কী নীতিমালা বা সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকা উচিৎ।

62. বাংলাদেশ নারী পুলিশসহ সকল সরকারি নারী কর্মকর্তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস (২০১১ সালে এটি চার মাস থেকে ছয় মাসে উন্নীত করা হয়)।

এরপর নারী সদস্যদের বাস্তবক্ষেত্রে যেসব সুনির্দিষ্ট অবকাঠামোগত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হতে হয় সেই সম্পর্কে জানাতে আমরা তাদের প্রশ্ন করি যে তাদের জন্য পৃথক টয়লেট বা বিশ্রাম কক্ষ রয়েছে কিনা।

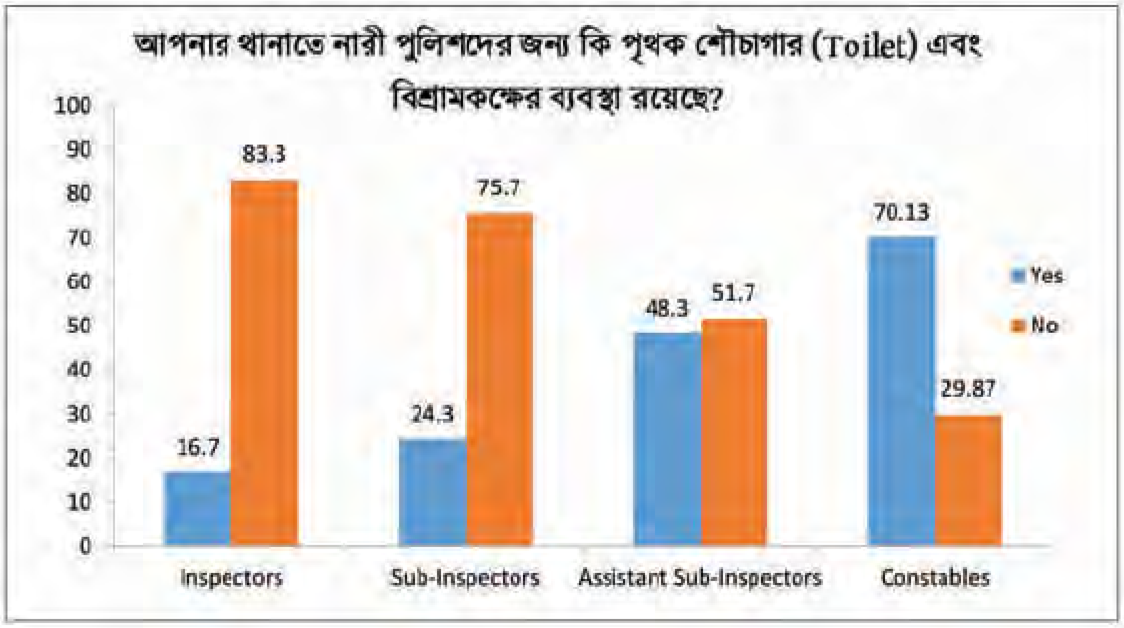

সামষ্টিকভাবে ইনস্পেক্টর এবং সাব-ইনস্পেক্টরদের অধিকাংশ জানান, তাদের থানায় কোনও পৃথক টয়লেট বা বিশ্রাম কক্ষ নেই। বেশিরভাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর একই রকম উত্তর দেন।

এখানে, বিভিন্ন রেঞ্জের মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা গিয়েছে। চট্টগ্রামে ১০০% ইনস্পেক্টর, ৯২.৯% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৮৮.৯% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর মৌলিক প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহের অভাবের কথা জানান। ঢাকাতেও ১০০% ইনস্পেক্টর এবং সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৯২.৩% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর উত্তর দেন যে তাদের থানায় নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট এবং বিশ্রাম কক্ষ নেই। কিন্তু সিলেটে ভিন্ন চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সিলেটে ১০০% ইনস্পেক্টর, ৭০% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৯২.৯% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর জানান যে, তাদের থানায় এসকল সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

চট্টগ্রামের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন, শুধু যে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের অভাব রয়েছে তাই না, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার টয়লেট সর্বদা তালা দেয়া থাকে যাতে অন্যেরা তা ব্যবহার করতে না পারে। যদিও জরিপের ফলাফলে সিলেটের মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত অনুসারে সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য অবস্থা দেখা গেছে। অংশগ্রহণকারীরা জানান, শুধুমাত্র মডেল থানাসমূহে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট বিদ্যমান রয়েছে[63]। এতে আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তারা আরও জানান যে, পোশাক পরিবর্তনের জন্য কোনও পৃথক কক্ষ নেই[64]।

যখন কনস্টেবলদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়, সামষ্টিকভাবে ৭০.১৩% বলেছিলেন যে, পৃথক টয়লেট এবং বিশ্রাম কক্ষ আছে। শুধু একটি রেঞ্জ থেকে ভিন্নমত পাওয়া যায়। সেটি হলো চট্টগ্রাম। এখানে ৯৩.৯৪% নারী কনস্টেবল বলেন যে এরকম পৃথক সুবিধা বিদ্যমান নেই। চট্টগ্রামে পরিচালিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

63. মডেল থানা হল পিআরপি এর একটি কর্মসূচি, যা একটি সুসজ্জিত মডেল থানা হিসেবে কাজ করবে এবং পুরনো থানাগুলোর সংস্কারেও মডেল হিসেবে কাজ করবে। বিস্তারিত: http://www.prp.org.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=55. (Last visited Nov.25, 2015).

64. কেউ কেউ বলেছেন যে এটি প্রয়োজনীয় নয়, কারণ তারা সিনিয়র পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। এই উন্মুক্ত আচরণ ইতিবাচক হলেও পৃথক পোশাক পরিবর্তনের ব্যবস্থা একটি মূল সমস্যা হিসেবে থেকেই যায়।

চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা পুনর্ব্যক্ত করেন যে, কিছু কিছু স্থানে পৃথক টয়লেট এবং বিশ্রাম কক্ষ রয়েছে, কিন্তু সব জেলাতে নেই।

এতো ব্যাপকসংখ্যক নারীকে পৃথক টয়লেট এবং বিশ্রামকক্ষের সুবিধা ছাড়া কাজ করতে হলে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই তাদের কাজের ওপর পড়বে। নারীরা পুরুষদের সাথে একই স্থানে শয়ন করতে এবং বিশ্রাম করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না। এছাড়াও পৃথক টয়লেটের অভাব নারীদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্যেও একটি সমস্যা, বিশেষ করে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পর সেটি পরিত্যাগের সময়। যেকোনো সরকারি অফিসে এই সুবিধা থাকা উচিৎ। নারী পুলিশদের প্রলম্বিত সময় ধরে কাজ করার বিষয়টি বিবেচনা করলে এই সমস্যার জটিলতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, কিছু নতুন থানা, বিশেষ করে মডেল থানাসমূহে যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বেশিরভাগ থানা বেশ পুরনো এবং এগুলোতে সংস্কার প্রয়োজন। নারী পুলিশ সদস্যদের এসকল মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য, বিশেষ করে ভবিষ্যতের নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে, এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ করার বিষয়টি মনে রাখা উচিৎ। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অর্থ বরাদ্দ করার বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া উচিৎ, কারণ সেখানেই বর্তমানে প্রয়োজনের মাত্রা সবচেয়ে বেশী।

তহবিল বরাদ্দ করলে এবং জেন্ডার নীতিমালা বাস্তবায়নে করলে এই অভাব দূর করা যেতে পারে। জেন্ডার নীতিমালাতে বলা হয়েছে:

১। সকল থানা/রেঞ্জ/ইউনিট, পুলিশ স্কুল এবং বাংলাদেশ পুলিশের সকল কার্যালয়ে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে।

২। সকল থানাতে নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে।

জরিপের পরবর্তী প্রশ্নটি ছিল, নিজের জেলা থেকে দূরে অন্য জেলায় কর্মরত নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাকের ব্যবস্থা রয়েছে কিনা?

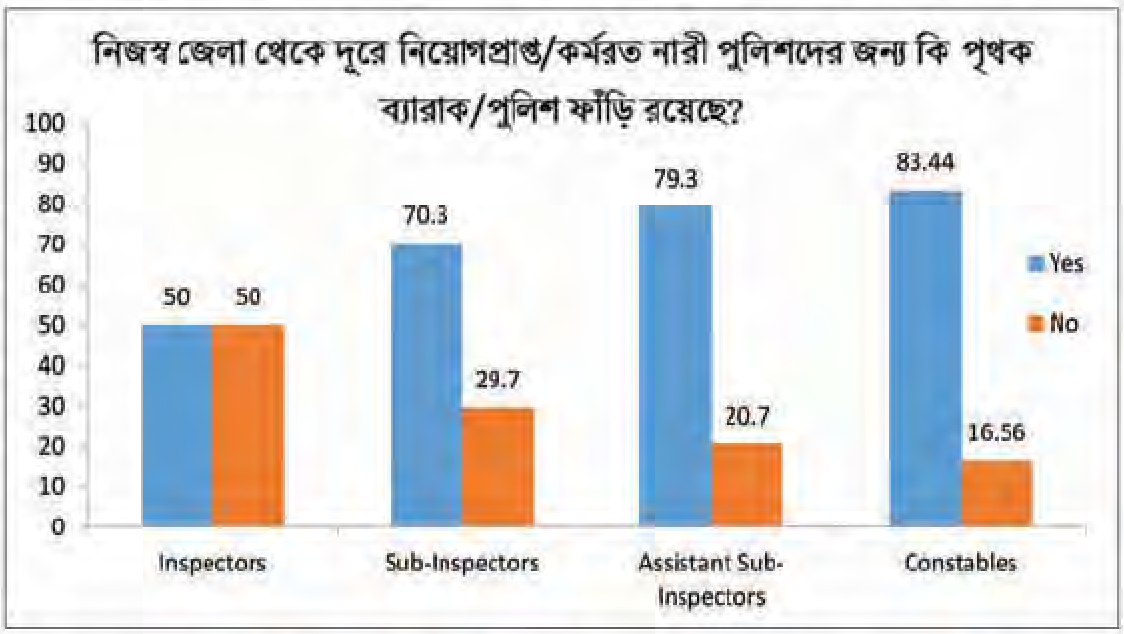

এই প্রশ্নের উত্তরে ৫০% ইনস্পেক্টর, ৭০.৩% এসআই এবং ৭৯.৩% এএসআই বলেছেন যে নিজের জেলা থেকে দূরে অন্য জেলায় কর্মরত নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাকের ব্যবস্থা রয়েছে। একইভাবে ৮৩.৪৪% নারী

কনস্টেবলও বলেছেন, নিজের জেলা থেকে দূরে অন্য জেলায় কর্মরত নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাকের ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে চট্টগ্রামের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে কনস্টেবলরা বলেছেন, নারীদের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি থানার সাথে সংলগ্ন ব্যারাক রয়েছে। তারা জানান, পুলিশ লাইন[65] সমূহে নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাক থাকার সম্ভাবনা বেশি। সিলেটে মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তারা জানান, সকল থানাতে পুরুষ এবং নারী সদস্যদের জন্য পৃথক ব্যারাকের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু পোশাক পরিবর্তনের জন্য পৃথক কক্ষ নেই।

দেশব্যাপী থানার সংখ্যার তুলনায় নারী পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় প্রত্যেক থানাতে নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাকের ব্যবস্থা থাকার সম্ভাবনা কম। প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক উত্তরের সংখ্যা এতো বেশী হওয়ার একটি কারণ হতে পারে যে, নারী পুলিশ সদস্যদের যেসকল স্থানে মোতায়েন করা হয়েছে, কেবলমাত্র সেই সকল স্থানেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথক ব্যবস্থা না থাকলে হয়তো তাদেরকে সেখানে মোতায়েন করাই হতো না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের জরিপে নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাকের ব্যবস্থার অভাবের ব্যাপকতা সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুটিত হয়নি।

কর্মক্ষেত্রে পৃথক ব্যারাকের অভাবে নারীরা অনেক স্থানে কাজ করার সুযোগ পায় না, এসব স্থানে হয়তো তাদের দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার হতে পারতো এবং তাদের পেশাগত জীবনের জন্য সহায়ক হতো। নারীদের জন্য পৃথক ব্যারাক নেই এমন স্থানে যেসকল নারী চাকরির জন্য যায়, সেখানে তাদের প্রায়শই বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হয়, যার ব্যয় বহন করা তাদের স্বল্প বেতনে বেশ কষ্টসাধ্য[66]। বৃহত্তর প্রেক্ষিতে নারীদের কোন স্থানে মোতায়েন করা হবে সে বিষয়ে কোনও সীমাবদ্ধতা থাকলে, যেসকল স্থানে যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে সে সকল স্থানেও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ বাধাগ্রস্ত হয়।

একজন সিনিয়র ক্যাডার কর্মকর্তা বলছিলেন,

"বাংলাদেশ নারী পুলিশ সদস্যদের মূল্যায়ন করতে হবে। আর এটা করা সম্ভব হলেই তাদেরকে মৌলিক সুবিধাগুলো প্রদান করা হবে, যাতে তারা পুলিশ বিভাগে তাদের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারে। এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যাতে নারী পুলিশ সদস্যরা মনে করেন যে, তাদেরকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং তাদেরকে বোঝা না ভেবে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বর্তমানে বিষয়টি প্রয়োজনভিত্তিক, মূল্য ভিত্তিক নয়"।

সিনিয়র কর্মকর্তাদের মতে, নারী পুলিশ সদস্যদের যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজনীয় সুবিধা না দিয়ে শুধু নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সরকারের জন্য যথেষ্ট নয়। জেন্ডার নীতিমালার বেশ কিছু সুপারিশ এই সমস্যার কিছুটা মোকাবেলা করতে পারবে:

- সন্তান জন্মদানের সময় একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা পূর্ণ বেতনসহ ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকারী হবেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে মেডিকেল লিভ, অ্যানুয়াল লিভ, এবং অবৈতনিক ছুটিও এর সাথে যুক্ত হতে পারে।
- বাংলাদেশ পুলিশের সকল নারী-ব্যারাক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইউনিট এবং ডিপার্টমেন্টে দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র এবং শিশু কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকবে।
- দিবা পরিচর্যা কেন্দ্রসমূহ বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত হবে। পুলিশ পিতা/মাতাকে তাদের সন্তানের এই সেবা লাভের জন্য নুন্যতম ব্যয় বহন করতে হবে।

65. থানা একটি ব্যবহারিক পুলিশ ঘাঁটি, যা একটি নির্দিষ্ট এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা দেখাশোনা করে, কিন্তু পুলিশি লাইন মূলত আবাসিক ব্যবস্থা।

66. আমাদের সাক্ষাৎকার অনুসারে, মূল বেতন হচ্ছে ৪৫০০ বাংলাদেশী টাকা।

- দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র সমূহে পুলিশের সন্তানদেরকে প্রি-স্কুলিং (স্কুল পূর্ববর্তী) সেবা প্রদান করা হবে।
- সকল থানাতে শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য একটি পৃথক স্থানের ব্যবস্থা থাকবে।

যখন সরকার এবং বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ নারী পুলিশদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেবে তখন একই সাথে নারী পুলিশদের স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার উপযোগী অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধাও নিশ্চিত করতে হবে। কর্ম-পরিবেশে এটি নিশ্চিত করতে কবে।

৫। প্রশিক্ষণ এবং পেশাদার উন্নয়ন

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের দৈর্ঘ্য এবং বিষয়বস্তু নির্ভর করে একজন প্রার্থী কোন পদমর্যাদায় নিয়োগ পেয়েছে তার ওপর।

পুলিশে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পরে প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্যাডার সার্ভিসসমূহ: চাকরিতে যোগদান করার পর পুলিশ অফিসারদের এএসপি প্রবেশনার হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে একটি এক-বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে আইন, শারীরিক প্রশিক্ষণ, গাড়ি চালানো, কম্পিউটার, অশ্বারোহণ এবং বন্দুক চালানো বিষয়ক জ্ঞান এবং দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এরপর তারা কোনও একটি জেলায় প্রবেশনার হিসেবে ছয় মাসের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) তে ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ নেন। এছাড়াও তাদের পেশাগত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন।

সাব-ইনস্পেক্টর: নিয়োগের পরে বাহ্যিক ক্যাডার (Outside Cadet) হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে এক বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হয়। তারপর নিয়োগপ্রাপ্তদের বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের সাথে আরও এক বছরের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও সাব-ইনস্পেক্টরদের চাকরিরত অবস্থায় দেশে-বিদেশে অনেক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

সার্জেন্ট: নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর সার্জেন্টরা প্রবেশনারি সার্জেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীতে একটি ছয় মাসের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তারপর তারা তাদের কর্মক্ষেত্রে পরবর্তী ছয় মাসের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়াও সার্জেন্টরা চাকরিরত অবস্থায় দেশে-বিদেশে অনেক অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

কনস্টেবল: নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর কনস্টেবলরা বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীসহ বিভিন্ন সেন্টারে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) হিসেবে ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়াও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উন্নতির জন্য কনস্টেবলরা চাকরিরত অবস্থায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকেন।

বর্তমান প্রশিক্ষণসমূহ কিভাবে পরিচালিত হয় এবং আরও কী কী প্রয়োজন রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে আমরা মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কনস্টেবলদেরকে প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করি। প্রথম প্রশ্নটি ছিল, পুরুষ এবং নারী পুলিশ সদস্যদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে শারীরিক বা অন্য কোনও রকমের পার্থক্য আছে কিনা।

মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বেশিরভাগ জানান, পুরুষ এবং নারীদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। কনস্টেবলদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সদস্য বলেন যে, প্রশিক্ষণ মূলত: একই।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের অংশগ্রহণকারীরা জানান যে, এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক পার্থক্য আছে। এর একটি হচ্ছে, নারী ও পুরুষের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চতা বিষয়ক। এছাড়াও শারীরিক প্রশিক্ষণের সময় নারীরা মাসিক চলাকালীন অবস্থায় তিন দিন ছুটি নিতে পারে, যা অতিরিক্ত ১৫ দিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুষিয়ে নেয়া হয়।

> এটি বেশ আশাব্যঞ্জক যে, নারীরা পুরুষদের সমান প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তবে প্রশিক্ষণ চলাকালে আরও কিছু সমস্যা দেখা যেতে পারে। যেমন একজন পুরুষ সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাতকারে উল্লেখ করা হয় যে, শারীরিক প্রশিক্ষণ চলাকালে নিয়োগপ্রাপ্ত পুরুষরা "হয়তো নারীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যবিষয়ক অশালীন মন্তব্য করতে পারেন"। নিয়োগপ্রাপ্ত নারীদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার আশংকার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চলাকালে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এরকম কোনও কিছু পাওয়া গেলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে দ্রুত ও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই তথ্য থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, নারী সদস্যরা তাদের প্রশিক্ষণ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। এটি একটি আশাব্যঞ্জক লক্ষণ। তাই প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগত বিষয়ে কোনও সমস্যার কথা না বলে অংশগ্রহণকারীরা নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের লক্ষ্য পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব রাখেন।

> আমাদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে সদস্যরা বিশেষ করে গাড়ি চালানো, কম্পিউটার এবং ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সিলেটে মধ্য-পর্যায়ের নারী কর্মকর্তারা সাইবার-অপরাধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা আরও বলেন, তারা বছরে যে ৪-৫ টি প্রশিক্ষণ পান সেগুলোতে ৩-৭ দিনের সেশন অপর্যাপ্ত। তারা মনে করেন যে, এই প্রশিক্ষণসমূহ ১৫ দিনব্যাপী হওয়া উচিৎ।

নারী পুলিশ সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র নারী কর্মকর্তারা বেশ কিছু প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তারা নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণসমূহের পরামর্শ দেন:

- স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট (মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা) – "যদি নারীরা বিবাহিত হন তবে পারিবারিক কিছু দায়িত্ব থাকবেই এবং আপনাকে কর্মজীবন এবং পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে। প্রশিক্ষণে মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোনও কিছু আলোচনা করা হয় না"।[67]

- শারীরিক প্রশিক্ষণ – "একবার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে, আপনার শারীরিক ফিটনেস (যোগ্যতা/সুস্থতা) পরীক্ষা করার এবং প্রশিক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। সেনাবাহিনীতে প্রতিবছর একটি করে শারীরিক প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা হয়"।[68]

এছাড়াও সিনিয়র কর্মকর্তারা আরও ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে নারী সদস্যরা পুলিশের কাজের সবক্ষেত্রেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। এই বক্তব্যে ২০০১ সালে পিআরপি পরিচালিত জরিপে প্রাপ্ত তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি পাওয়া গেছে, যেখানে জানা গিয়েছিল যে, পুরুষ সহকর্মিদের তুলনায় নারীরা অপরাধ ব্যবস্থাপনা এবং অপরাধ তদন্ত বিষয়ে কম প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। ৪.৩% নারী কর্মকর্তা বলেছেন যে, তারা এমন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, অন্যদিকে ১৫.৫% পুরুষ কর্মকর্তা এমন প্রশিক্ষণ পাওয়ার কথা জানান।[69]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, পুলিশ বিভাগে যোগদান করার পর নারী ও পুরুষ সদস্যদের সমান পরিমাণ প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও, পরবর্তীদের নারীদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। এতে তাদের পেশাগত অগ্রগতি এবং তাদের অর্জনের সম্ভাবনা প্রভাবিত হয়। এর ফলে অন্য নারী পুলিশরা খুব কমসংখ্যক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব পান।

অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব বিষয়ে আরও জানতে, কনস্টেবলদের প্রশ্ন করা হয়েছিলো, "আপনার জানা মতে কোনও একজন কনস্টেবল সর্বোচ্চ কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন"? বেশিরভাগ নারী উত্তর দেন, একজন কনস্টেবল সাধারণত সর্বোচ্চ ইনস্পেক্টর পদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। তবে অনেকে উচ্চতর শিক্ষাগত ডিগ্রী অর্জন করে এবং বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করে ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন।

অন্য অংশগ্রহণকারীরা তাদের উত্তরে জানান যে, তাদের সরাসরি পরিচিত নারীরা নির্দ্দিষ্ট কিছু পদে উন্নীত হয়েছেন। এর মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বেশ কয়েকজন মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তার কথা উল্লেখ করেন তারা। কয়েকজন অংশগ্রহণকারী সহজ ভঙ্গিতে বলেন যে, নারীরা শুধু কনস্টেবল পদেই কাজ করেন। এতে মনে হতে পারে যে, হয় তারা প্রশ্নটি বুঝতে ভুল করেছেন, অথবা তারা মধ্য পর্যায়ে পদোন্নতি হওয়ার বিষয়টি সচরাচর দেখেন না।

এরপর আমরা নারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে সার্বিকভাবে আরও তথ্য জানতে চাইলাম। এ পর্যায়ে আইন ও পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশ্ন করা হয়েছিল।

প্রায় সকল মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তারা মনে করেন যে প্রশিক্ষণের পরে তাদের কাজের সাথে সম্পর্কিত আইন এবং পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে তাদের পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছে। একইভাবে কনস্টেবলদের বেশিরভাগ (৯৪.৭৭%) সেরকমই মনে করেন।

67. ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে সিনিয়র ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার।

68. ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে সিনিয়র ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার।

69. বাংলাদেশ পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম (২০১১), "বাংলাদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং পুলিশের পারফরম্যান্স বিষয়ক বেজ-লাইন সার্ভে", পৃষ্ঠা- ২১, http://prp.org.bd/downloads/Baseline%20Survey%20on%20Personal%20Security%20and%20Police%20Performance%20in%20Bangladesh%20-Summary%20Report.pdf as on 2 December 2015

তবে চট্টগ্রামের কনস্টেবলদের একাংশ (১২.১২%) এবং ঢাকার ৬.১৫% মনে করেন, আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত ছিল না। চট্টগ্রামের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে এটি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা ছয় বছর কনস্টেবল পদে কাজ করার পর পদোন্নতি পান। তারা জানান, তারা মধ্য পর্যায়ের পদে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে অফিসিয়াল প্রশিক্ষণের বাইরেও নিজেদের উদ্যোগে আইন ও পদ্ধতি বিষয়ক লেখাপড়া করেছেন। আরো জানা যায় যে, ঢাকা মেট্রোপলিটনের কনস্টেবলদের আইন বিষয়ক ক্লাস নেয়া হলেও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশে কনস্টেবলদের জন্য এই ব্যবস্থা নেই।

যেহেতু নারীদের পেশাগত অগ্রগতি প্রশিক্ষণ লাভ ও পদোন্নতির পরীক্ষার প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে, তাই পুলিশ বিভাগ সকলের জন্য সমান উন্নয়নের সুযোগ প্রদান করবে বলে আশা করা যায়।

সব পদ মর্যাদার বেশিরভাগ সদস্য জানান যে, তাদের প্রশিক্ষণে জেন্ডার সচেতনতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। যারা উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন, তাদের মতে এটি বেশ কার্যকরি ছিল।

তবে জেন্ডার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিদ্যমান থাকায় এই বিষয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি থাকতে পারে। যেমন ঢাকার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে একজন মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা বলেন, জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে নারী ও শিশু বিষয়ক একটি ম্যানুয়াল ছিল, যা প্রশিক্ষণে শেখানো হয়।

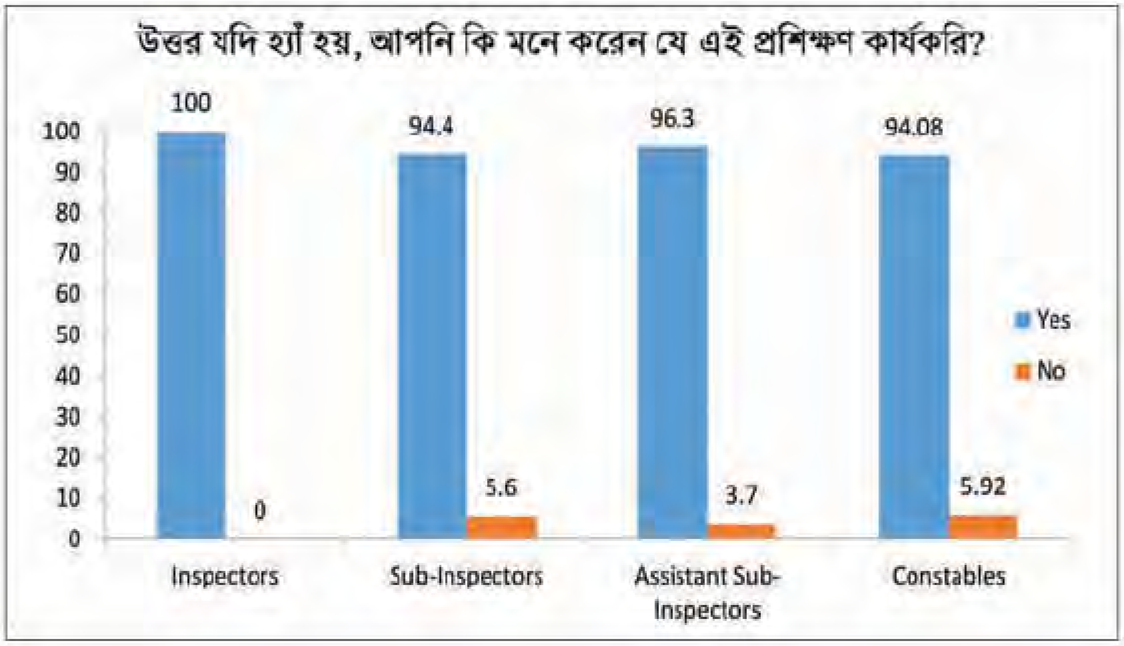

এছাড়াও চট্টগ্রামের মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তারা বলেন, পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজের কোর্সে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তারা মনে করেন যে জেন্ডার সচেতন হওয়ার জন্য পুরুষদের আরও বেশি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। চট্টগ্রামের কনস্টেবলরাও একই মত প্রকাশ করেন।

এমন হতে পারে, যারা বলেছেন প্রশিক্ষণে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না তারা হয়তো এই বিষয়ে কোনও প্রশিক্ষণ পাননি অথবা যে বিষয়টি শেখানো হয়েছিলো তা উপলব্ধি করতে বা বুঝতে সক্ষম হননি। দুটি সম্ভাবনাই ইঙ্গিত করে যে, পুলিশ বাহিনীতে জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক কার্যকরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে কাজ করার বিষয়টির ব্যাপকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষেই যদি বিদ্যমান প্রশিক্ষণসমূহ কার্যকরি হতো তাহলে নারীরা এই পর্যায়ের পক্ষপাতিত্বের শিকার হতেন না।

এছাড়াও, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যদের সাথে সাথে সিনিয়র কর্মকর্তাদের জন্যেও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ক্যাডার পর্যায়ে নারীদের অন্তর্ভুক্তির দশ বছর পরেও বাংলাদেশ পুলিশের নেতৃত্বমূলক পর্যায়ে পুরুষদের বিদ্যমান আধিপত্য বিবেচনা করলে, এ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হবে। আমাদের সাক্ষাতকারে একজন নারী কর্মকর্তা পরামর্শ দিয়েছেন যে, "পুরুষ সিনিয়র কর্মকর্তাদেরকে জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া উচিৎ। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ক্যাডার পদে শুধু পুরুষদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর এ কারণেই এখন তারা ডিআইজি পদে রয়েছেন"। যেহেতু পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়েছে, সে কারণে যেসকল কর্মকর্তা এর আগে যোগদান করেছেন তাদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে[70]। জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব দূর করতে হলে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নেতৃত্ব-স্থানীয় কর্মকর্তাদের উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়া এটি সম্ভব হবে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এড়িয়ে না গিয়ে অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ।

70. চট্টগ্রাম ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

৬। নারী পুলিশ এবং নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা/অপরাধ

পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে এবং অপরাধের শিকার নারী ও কন্যাশিশুদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা এবং সচেতনতা অপরিহার্য। পুলিশ ব্যবস্থার মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার সচেতনতা প্রসঙ্গে জানতে আমরা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দুই প্রেক্ষাপটেই কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং এবং কনস্টেবলদের অধিকাংশই মনে করেন যে, অপরাধের শিকার নারীরা পুরুষ পুলিশ সদস্যদের চেয়ে নারী পুলিশ সদস্যদের সাথে কথা বলতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আমাদের সাথে সাক্ষাৎকারে একজন সিনিয়র নারী কর্মকর্তা তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন:

"আমি কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সহিংসতার কেস নিয়ে কাজ করেছিলাম এবং নারীরা তাদের ঘটনা বর্ণনা করার জন্য আমাকে ডাকতেন। যারা আমাকে নারীদের সাথে কাজ করতে দেখেছিলেন তারা আমার সাথে পরে যোগাযোগ করেছেন, যদিও তখন আমি অন্যস্থানে বদলী হয়ে যাই। আমি অন্য স্থানে চলে যাওয়ার পরও তারা আমাকে মনে রেখেছেন এবং আমাকে কল করেছেন"।[71]

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে নারী ভিক্টিমরা নারী পুলিশদের সাথে কথা বলতে চায় তার কারণ পুরুষ পুলিশ সদস্যদের যথাযথ জেন্ডার সংবেদনশীলতার অভাব রয়েছে। তাদের বক্তব্য অনুসারে, কোনও ধর্ষণের ঘটনায় পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তারা বারংবার মনে করেন যে, "ধর্ষণের শিকার নারীর চরিত্রে কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে"।

তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও, এটি স্পষ্ট যে আরও বেশি পরিমাণ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই ধরনের জরিপে এই ব্যবধানের কারণ নিরূপণ করা সম্ভব নয়, তবে এর মাধ্যমে অন্তত সমস্যাটি চিহ্নিত করা গেছে। কেন বিদ্যমান প্রশিক্ষণসমূহ কোনও ফলাফল নিয়ে আসতে পারেনি, বাংলাদেশ পুলিশকে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই অনুসারে পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে, যেমন আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং যৌন নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাসমূহ কিভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং এর প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে। আশা করা হচ্ছে যে ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার এর কার্যক্রম নারী ভিক্টিমদের সেবা প্রদানে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

71. ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে সিনিয়র ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার।

নারী ভিক্টিমদের সাথে নারী পুলিশদের কথা বলার গুরুত্ব সম্পর্কে নারী সদস্যদের মতামত জানার পরে কিভাবে এই চর্চাকে উৎসাহিত করা যায় সে সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন করি।

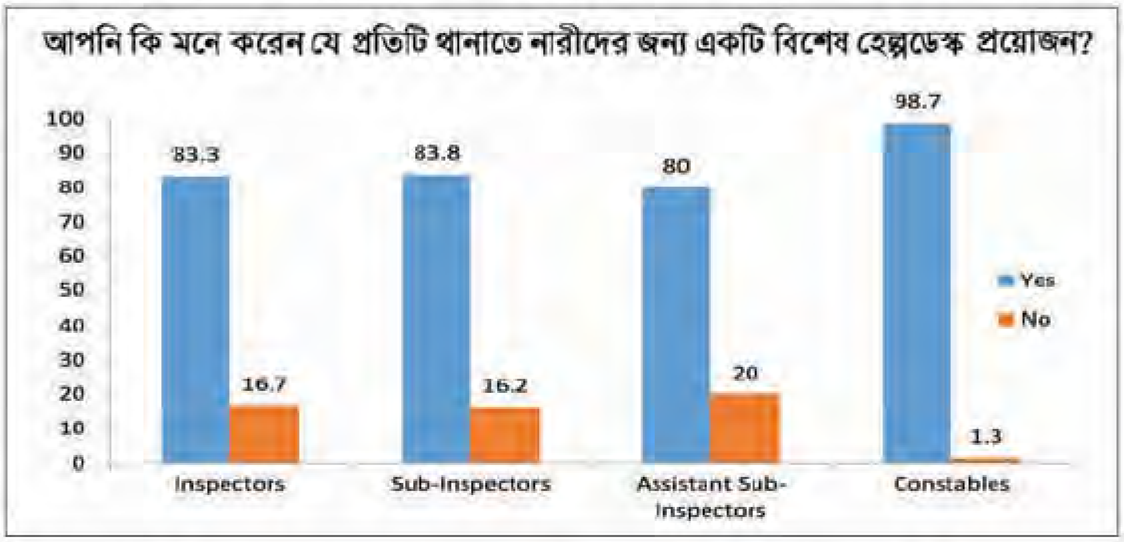

মধ্য পর্যায়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগের মতে এবং প্রায় সকল কনস্টেবলদের মতে প্রতিটি থানাতে একটি নিবেদিত নারী সহায়তা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই তথ্য আরেকটি জরিপের তথ্য সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে জানা গিয়েছিল যে নারী পুলিশরা বিশ্বাস করেন যে নারী ভিক্টিমরা যদি নারী পুলিশদের সাথে কথা বলতে পারে তবে নারীরা পুলিশের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পুলিশ বিভাগে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্যে সরকার ইতোমধ্যেই কিছু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই নতুন নিয়োগসমূহকে সবচেয়ে কার্যকর করার একটি উপায় হচ্ছে দেশের প্রত্যেক থানাতে নারীদের জন্য সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা। এতে নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ নারীরা যখন জানতে পারবে যে থানাতে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা রয়েছে, তখন তারা পুলিশের আছে যেতে সুরক্ষিত বোধ করবে।

কেউ কেউ প্রস্তাব করেন, কিছু মডেল থানা প্রতিষ্ঠা করা যায় যেখানে শুধু নারী পুলিশ থাকবে, যাতে এলাকার নারীরা, বিশেষ করে ভিক্টিমরা পুলিশের কাছে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। থানাতে নারী সহায়তা কেন্দ্র বনাম শুধু নারী পুলিশ অধ্যুষিত থানার প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে আমরা মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করেছিলাম তারা কি এমন কোনও থানাতে কাজ করতে পছন্দ করবেন কীনা যেখানে শুধু নারী পুলিশরা থাকবেন।

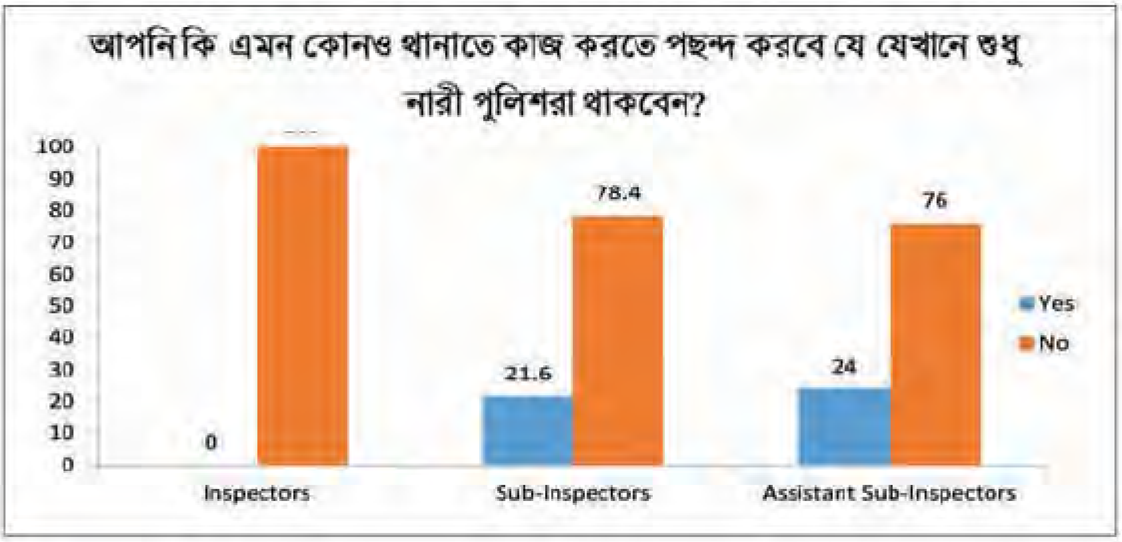

বেশিরভাগ মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তা বলেন যে, তারা এমন কোনও থানাতে কাজ করতে চাইবেন না যেখানে শুধু নারী পুলিশ আছে। এই প্রসঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টরদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরদের চার ভাগের একভাগ জানান, তারা শুধু নারী পুলিশ সম্বলিত থানাতে কাজ করতে চাইবেন।

যদিও কনস্টেবলদের[72] জরিপে এই বিষয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না, আমরা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। তারা এই ধারণাকে আশ্চর্যজনক মনে করেছেন। তাদের কাছে এই ধারণাকে হয় অকার্যকর অথবা উদ্ভট মনে হয়েছে। শুধুমাত্র নারী পুলিশ সম্বলিত থানা পাকিস্তান এবং ভারতে রয়েছে (যদিও তাদের কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে), কিন্তু বাংলাদেশে এমন ধারণার কথা কেউ আগে কখনও শোনেনি।

এটি স্পষ্ট যে নারী পুলিশ সদস্যরা শুধু নারী পুলিশ সম্বলিত থানার চেয়ে, থানাতে নারীদের জন্য সহায়তা ব্যবস্থার প্রস্তাবটি বেশি পছন্দ করেছেন। আমাদের যেসব সিনিয়র নারী কর্মকর্তারা সাক্ষাতকার নিয়েছি তারাও একই রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। একজন বলেন, "শুধুমাত্র নারী পুলিশ সম্বলিত থানার ধারণাটি ভাল না এবং এটি বাস্তবতা বিবর্জিত...থানাকে নারীদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। নারীদের প্রতি সংবেদনশীল পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত নারী সহায়তা ব্যবস্থার প্রস্তাবটি ভাল"। আরেকজন বলেন যে, যদি নারীদেরকে শুধুমাত্র নারী পুলিশ সম্বলিত থানাতে ফেলে রাখা হয়, তবে নারী পুলিশরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারা শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে[73]।

যেসকল স্থানে সুযোগ-সুবিধা ও পেশাগত উন্নয়নের সম্ভাবনা অবকাঠামোগত কারণে পুরুষ পুলিশ সদস্যদের তুলনায় নারী পুলিশদের জন্য সীমিত, বিশেষত সেসকল স্থানে পৃথকীকরণের ধারণাটি সম্পর্কে নারীদের অনীহা বেশ প্রকট। প্রকৃতপক্ষে অনেক নারী পুলিশ সদস্যের মধ্যে এরকম উদ্বেগ রয়েছে যে নারী পুলিশদেরকে শুধুমাত্র অপরাধের শিকার নারী ও কন্যাশিশুদের সেবা প্রদানের জন্যই নিয়োগ করা হচ্ছে।

২০১১ সালে পিআরপি কর্তৃক পরিচালিত একটি জনমত জরিপে নারী পুলিশদের পুরুষ পুলিশদের সমান কার্যকারিতা নিয়ে মিশ্র তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশ বিভাগে নারীদের ভূমিকা বিষয়ক একটি প্রশ্নের উত্তরে ৭৮% উত্তরদাতা বলেছিলেন যে, তারা নারী ও শিশু ভিক্টিমদের সহযোগিতা করতে পারবেন এবং মাত্র ২৪.৯% বলেছিলেন, তারা অপরাধ দমন এবং অপরাধ তদন্তে ভূমিকা রাখতে পারবেন[74]।

এই বিষয়গুলি মনোযোগ এবং সম্পদ বিনিয়োগের দাবিদার। তবে নারীরা পুলিশ ব্যবস্থার যেসব ক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী, সেই ক্ষেত্রেই তাদের পেশাগত অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মাঠ-পর্যায়ে এ সংক্রান্ত বাস্তবতা জানার জন্য আমরা ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টরদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাদেরকে কোনো গুরুতর মামলা তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় কীনা।

---

72. জরিপের প্রাথমিক পরিকল্পনায় আমরা শুধু মধ্য পর্যায়ের সদস্যদের এই প্রশ্নটি করতে চেয়েছিলাম। কারণ নারী সদস্যদের শুধুমাত্র নারী পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত থানাতে মোতায়েন করা হলে তারা বিভিন্ন ধরনের মামলার তদন্ত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং এতে তদন্ত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত পদমর্যাদার সদস্যরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

73. সালের এপ্রিল মাসে সিনিয়র ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার।

74. বাংলাদেশ পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম (২০১১), "বাংলাদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং পুলিশের পারফরম্যান্স বিষয়ক বেজ-লাইন সার্ভে", পৃষ্ঠা-২১, http://prp.org.bd/downloads/Baseline%20Survey%20on%20Personal%20Security%20and%20Police%20Performance%20in%20Bangladesh%20-Summary%20Report.pdf (Last visited 2 December, 2015)

এক্ষেত্রে মিশ্র ফলাফল পাওয়া যায়। বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, পুরুষ সহকর্মিদের তুলনায় তাদেরকে তেমন গুরুতর মামলার দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। সার্বিকভাবে ইনস্পেক্টরদের দুই-তৃতীয়াংশ মনে করেন, গুরুতর মামলার দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের সমান দায়িত্ব পান না। সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইনস্পেক্টরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রায় সমান সমান ভাগে বিভক্ত। তবে উভয় ক্ষেত্রেই আনুপাতিকভাবে কিছু অধিক সংখ্যক সদস্য মনে করেন, এক্ষেত্রে তাদের সাথে সমান আচরণ করা হয়।

চট্টগ্রামের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র দুইজন নারী হত্যা মামলার তদন্ত করেছেন। এর মধ্যে একটি উন্মুক্ত মামলা ছিল, যেখানে দুইজন পুরুষ এক টাকা নিয়ে বিবাদ করেন এবং একজন নিহত হন। ঢাকার উত্তরদাতারা জানান যে তারাও গুরুতর মামলাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। যদিও কেউ কেউ বলেন যে, ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণে তাদেরকে নারীদের সাথে সম্পৃক্ত মামলার দায়িত্ব বেশি দেয়া হয়। তবে সিলেটের নারী পুলিশরা জানান, তাদেরকে সব রকমের মামলার দায়িত্বই দেওয়া হয়।

আমাদের সাক্ষাত-কৃত একজন সিনিয়র কর্মকর্তা একই রকম হতাশা ব্যক্ত করেন। তার মন্তব্যগুলো ছিল:

"তারা যোগ্য নারী কর্মকর্তাদেরকে অপরাধ বিষয়ক দায়িত্ব দেবেন না। নিজেদেরকে প্রমাণ করার জন্য নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে আগুন ধরে রাখতে হবে"।

"অপরাধ বিষয়ক দায়িত্ব নেয়ার জন্য আমি আমার সিনিয়রের কাছে অনুরোধ করতাম"।

"রোটেশন অনুসারে সবাইকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে পাঠানো উচিৎ। অপরাধ বিষয়ক কাজ করার জন্য আমাকে সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেন আমার এতো সময় লাগলো"?[75]

যেহেতু অনেক নারী জানান যে তাদেরকে গুরুতর মামলার দায়িত্ব দেয়া হয় না, সেহেতু একটি প্রশ্ন চলে আসে, তবে কি সিনিয়র কর্মকর্তারা মনে করেন যে নারীরা কঠিন মামলার দায়িত্ব পালন করতে পারেন না? এর একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে নারীদেরকে তেমন দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

75. ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে সিনিয়র ক্যাডার কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎকার।

নিঃসন্দেহে এই সমস্যাসমূহ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নারীদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার এবং গুরুত্ব না দেয়ার ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের আলোচনা এবং সাক্ষাতকারে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, পুলিশ বিভাগে নারীদের নিয়োগ করা হয় অনেকটা প্রয়োজনের ভিত্তিতে, মূল্যবোধভিত্তিক প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে নয়। পুলিশ বিভাগে নারীদেরকে নিয়োগ করা হয় "নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বিষয়ে কাজ করার জন্য, নারী অভিযুক্তদের পাহারা এবং নারী কৌঁসুলিদের সাথে কাজ করার জন্য"। এটি যদি মূল কারণ হয় তবে নারীদেরকে পুলিশ বিভাগে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করার প্রাতিষ্ঠানিক বাধাসমূহ সনাক্ত করার জন্য কোনও সুবিন্যস্ত প্রচেষ্টা হবে না। আবারো বলতে হচ্ছে যে, শুধুমাত্র নারী পুলিশ নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই যথেষ্ট নয়। নারীদেরকে পুলিশ ব্যবস্থা অঙ্গীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সনাক্ত করতে হবে এবং সকল বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

৭। সরাসরি পক্ষপাতিত্ব বা হয়রানি বিষয়ে নারীদের অভিজ্ঞতা

পুরুষ সহকর্মিদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-লাভ

অনেক বছর যাবত বাংলাদেশ পুলিশে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার ২% এর নিচে ছিল, এবং ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত কোনও নারীকে ক্যাডার পদে নিয়োগ করা হয়নি। এ তথ্যগুলো বিবেচনা করলে, অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পুলিশ বিভাগে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিরাজমান রয়েছে। এই গবেষণা এবং নারী পুলিশদের প্রতি তাদের পুরুষ সহকর্মিদের আচরণ বিষয়ক কিছু বাহ্যিক গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নারী পুলিশ কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কনস্টেবলদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা কি মনে করেন তাদের সিনিয়ররা তাদেরকে তাদের পুরুষ সহকর্মীদের সমান হিসেবে গণ্য করেন?

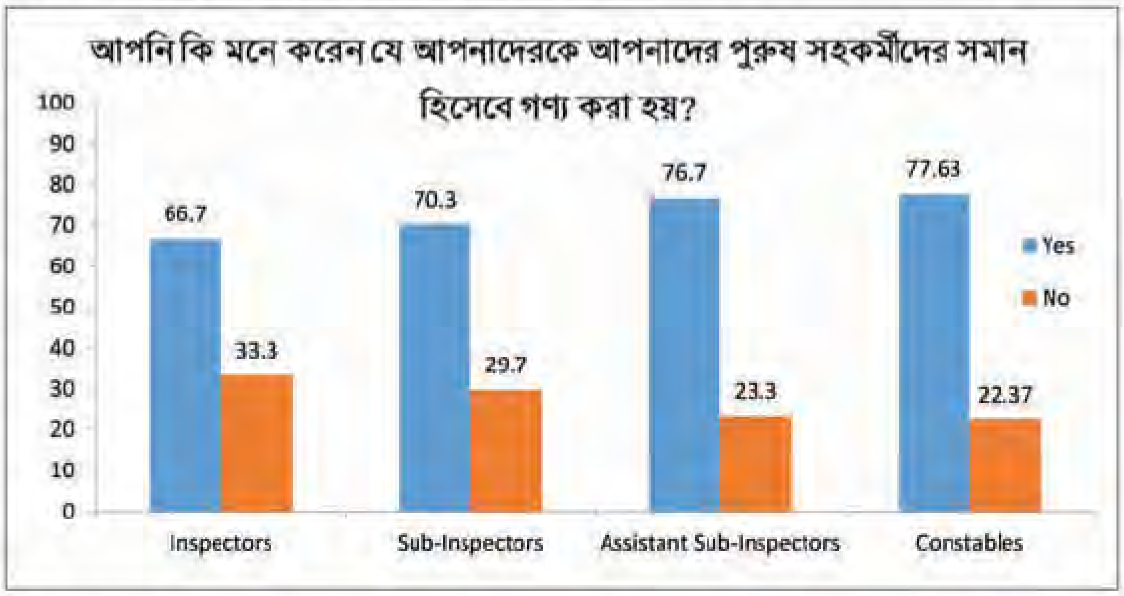

ইনস্পেক্টরদের এক-তৃতীয়াংশ, সাব ইনস্পেক্টরদের এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর ও কনস্টেবলদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জানান, তাদের মনে হয় পুরুষ সহকর্মীদের সমান হিসেবে গণ্য করা হয় না তাদের। উদ্বেগজনকভাবে, চট্টগ্রামে ৫৭.১৪% সাব ইনস্পেক্টর এবং ৭০% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর মনে করেন, তাদেরকে তাদের পুরুষ সহকর্মীদের সমান হিসেবে গণ্য করা হয় না। চট্টগ্রামে অংশগ্রহণকারী ইনস্পেক্টর জানান, তিনি নিজে সমান হিসেবে গণ্য হন বলে মনে করেন।

সৌভাগ্যজনকভাবে সকল রেঞ্জের নারী কর্মকর্তাদের অধিকাংশ মনে করেন না, তারা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের তুলনায় কোনো ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। তবুও এই সংখ্যাগুলো অনেক বেশী। এতোসংখ্যক নারীর বৈষম্যের শিকার হওয়ার অনুভূতিই প্রমাণ করে, নারী পুলিশদের প্রতি ভিন্ন ধরনের আচরণ করা হয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে অতীতে পিআরপি পরিচালিত জরিপে নারী কর্মকর্তাদের প্রতি পুরুষ কর্মকর্তাদের আচরণ/মনোভাবের কিছু উদ্বেগজনক ফলাফল পাওয়া যায়। এটি হয়তো বৈষম্যমূলক আচরণের মূল কারণগুলোর একটি।

২০১১ সালে পিআরপি পরিচালিত জরিপে ৫৫% পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তা বলেছিলেন, অপরাধ দমনে নারী পুলিশরা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের মতো কার্যকরি নন। প্রায় ৪০% বলেছিলেন, তারা অপরাধ তদন্তে কার্যকরি নন। অনেকে বলেছিলেন যে, এর কারণ হলো নারী কর্মকর্তাদের আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তবে পরবর্তী প্রশ্নোত্তরে, নারীদের বিপক্ষে একটি পূর্বসংস্কারের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়, যার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। যেমন ৫৬.১% পুরুষ কর্মকর্তা মনে করেন না যে নারী পুলিশ কর্মকর্তারা পুলিশ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে[76]।

এতে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর কয়েকবছর পরেও নারীদের সরাসরি বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পুলিশ বিভাগে জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব একটি কঠোর সত্য। এর প্রতিকার করতে হলে পুলিশ বিভাগকে উপলব্ধি করতে হবে যে, পুরুষ কর্মকর্তাদের মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব রয়েছে এবং জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়নকে অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ।

এরপর আমরা জানতে চাই, মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের উর্ধ্বতন সিনিয়র পুরুষ কর্মকর্তা এবং অধঃস্তন পুরুষ পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে কীরকম আচরণ পাচ্ছেন।

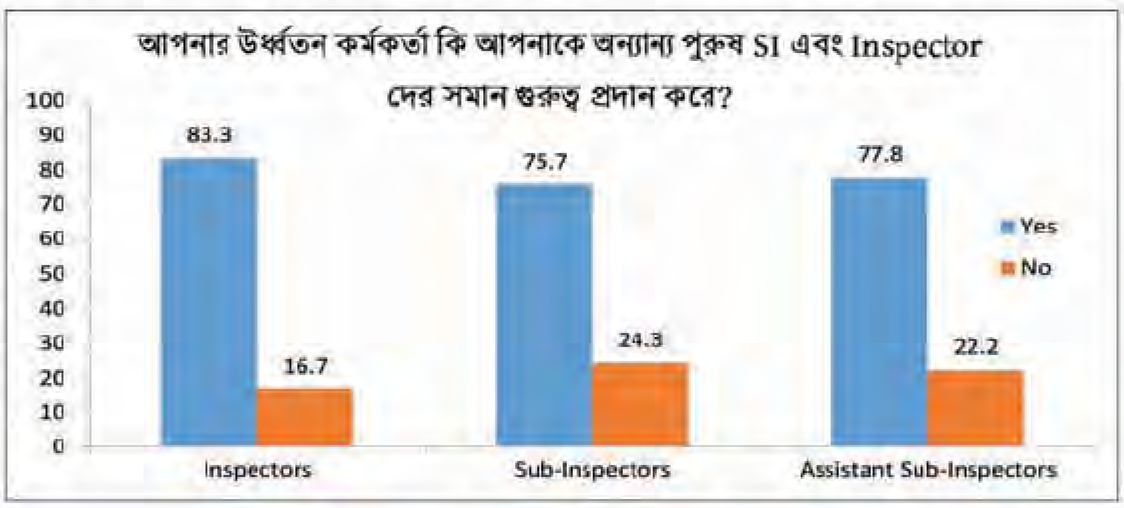

এক্ষেত্রে ৮৩% ইনস্পেক্টর, ৭৫.৭% এসআই এবং ৭৭.৮% এএসআই বলেন, তারা মনে করেন যে তাদেরকে তাদের পুরুষ সহকর্মিদের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সিলেটে প্রতিটি পদ মর্যাদার প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী এই প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলেছেন। ঢাকা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও বেশ ইতিবাচক ছিল। চট্টগ্রামে মাত্র একজন ইনস্পেক্টর সমান আচরণ পান বলে জানান, অন্যদিকে ৫৭.১৪% এসআই এবং ৭১.৪% এএসআই জানান যে তারা সমান আচরণ পান না।

76. বাংলাদেশ পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম (২০১১), "বাংলাদেশে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং পুলিশের পারফরম্যান্স বিষয়ক বেজ-লাইন সার্ভে", পৃষ্ঠা-২১, http://prp.org.bd/downloads/Baseline%20Survey%20on%20Personal%20Security%20and%20Police%20Performance%20in%20Bangladesh%20-Summary%20Report.pdf (Last visited 2 December, 2015)

এক্ষেত্রে সামগ্রিক তথ্যও বেশ উদ্বেগজনক। কারণ তিন পর্যায়ের নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনের একজন জানান যে, তারা তাদের পুরুষ সহকর্মিদের সমান আচরণ পান না। এরকম বৈষম্য শুধু যে নারীদের দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টি করে তাই না, এতে তাদের পেশাগত উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়, কারণ এর ফলে তাদেরকে চ্যালেঞ্জিং মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয় না, অথবা মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্ব স্থানীয় পদে প্রেরণ করা হয় না এবং তাদের পদোন্নতির সমান সুযোগকে অস্বীকার করা হয়।

এই তথ্য আবারো ইঙ্গিত করছে যে উচ্চতর পদের কর্মকর্তাদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। এর পেছনে হয়তো অনেকগুলো কারণ কাজ করছে, যেমন প্রকাশ্য পক্ষপাতিত্ব। হতে পারে যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নারীদেরকে কঠিন মামলা বা কঠিন কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব দিতে চান না কারণ তারা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পাননি, তারা অযোগ্য হিসেবে গণ্য হয়েছেন এবং তাদের নিজেদেরকে প্রমাণ করা প্রয়োজন। পুলিশ বিভাগের উচিৎ এই বিষয়ে আরও তদন্ত করা এবং উপলব্ধি করা যে জরিপে উল্লেখিত বিষয়গুলি কিভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং কিভাবে তা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাতিত্বের সাথে জড়িত এবং কেন এদের সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

এরপর মধ্য পর্যায়ের নারী কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাদের অধস্তন পুরুষ পুলিশ সদস্যরা তাদের আদেশ পালন করেন কিনা।

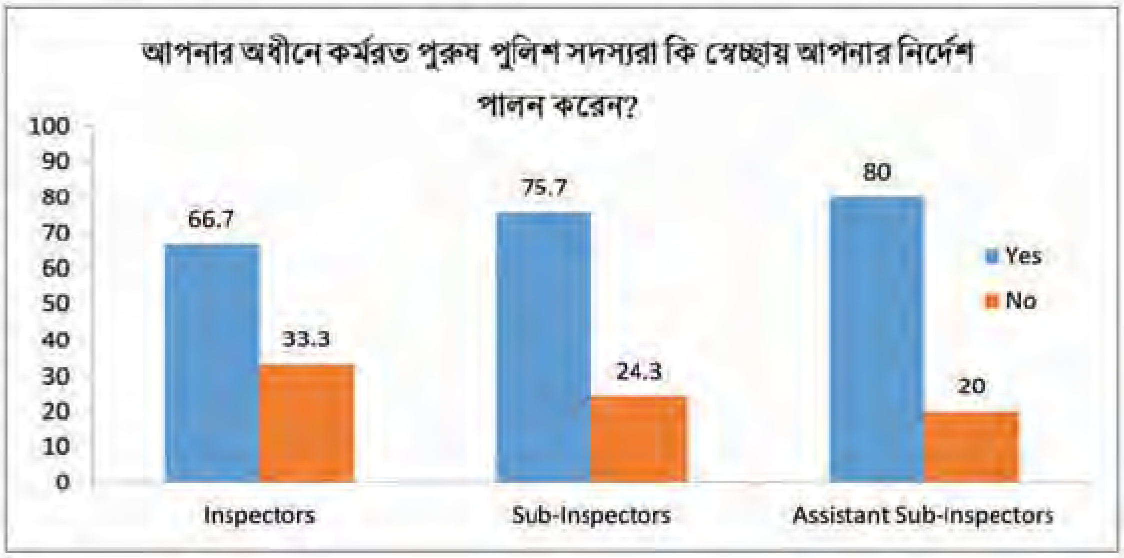

এক্ষেত্রে সার্বিক চিত্র বেশ ভাল। ৬৬.৭% ইনস্পেক্টর, ৭৫.৭% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৮০% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর বলেন যে, তাদের অধস্তন পুরুষ পুলিশ সদস্যরা তাদের আদেশ স্বেচ্ছায় পালন করেন। তবে চট্টগ্রাম ও ঢাকার তুলনায় সিলেট[77] থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনেক বেশি ইতিবাচক ছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম রেঞ্জের কিছু পদমর্যাদার[78] ৫০% এরও বেশি সদস্য বলেন যে তাদের অধস্তনরা তাদের আদেশ স্বেচ্ছায় পালন করেন না।

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে নারীরা জানান, অধস্তন পুরুষ সদস্যদের অনেকে প্রথমে তাদেরকে "স্যার" বলে সম্বোধন করতে চাননি। বরং তারা তাদের উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তাদের "আপা" বলে সম্বোধন করেন; যদিও তারা কখনই তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ কর্মকর্তাদেরকে "ভাই" বলে সম্বোধন করেন না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে "আপা" বা "ম্যাম" এই দু'টো সম্বোধনের কোনটিই "স্যার" সম্বোধনের এর সমান মর্যাদা বহন করে না।

77. সিলেটের প্রত্যেক পদমর্যাদার ১০০% উত্তরদাতা "হ্যাঁ" বলেন।

78. চট্টগ্রামে যেই একজন ইনস্পেক্টর ছিলেন, তিনি "হ্যাঁ" উত্তর দেন, তবে ৫৭.১৪% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৩০% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর "না" উত্তর দেন। ঢাকাতে চারজন ইনস্পেক্টরের মধ্যে দুইজন "না" উত্তর দেন, এবং দুইজন "হ্যাঁ' উত্তর দেন। ঢাকার ১৩ জন সাব-ইনস্পেক্টরের মধ্যে শুধু একজন "না" উত্তর দেন কিন্তু ৫০% অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর "না" উত্তর দেন।

উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তাদেরকে "স্যার" বলে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে অধস্তন পুরুষ সদস্যদের অনীহাই বলে দিচ্ছে তারা তাদের উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তাদেরকে কতটা সম্মান করেন। এছাড়াও আমাদের অংশগ্রহণকারীদের মতে, অধস্তন পুরুষ সদস্যরা ক্যাডার পর্যায়ের নারী সদস্যদেরকে সম্মান করে, কিন্তু মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে করে না।

তাদের মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

"অধস্তন পুরুষ সদস্যরা দ্বিধার সাথে আমাদের নির্দেশ অনুসরণ করে। তারা পুরুষ কর্মকর্তাদের আদেশ আরও স্বেচ্ছায় পালন করে এবং দক্ষতার সাথে তা করে। আমাদেরকে "স্যার" বলে সম্বোধন করতে তাদের একটু সমস্যা হয়; তারা আমাদেরকে "আপা" বলে সম্বোধন করে"।[79]

"আমাদেরকে "স্যার" বলে সম্বোধন করতে জুনিয়র পুরুষ সদস্যদের অসুবিধা হয়"।

"সিনিয়ররা আমাদেরকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জুনিয়রদেরকে নিয়ে"।

৮। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি

সহজেই অনুমান করা যায় যে, যৌন হয়রানির অস্তিত্ব এবং প্রকটতা বিষয়ক প্রাপ্ত তথ্য মিশ্র ধরনের ছিল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, সাধারণত নারীরা এই বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করেন না।[80]

বাস্তবক্ষেত্রে নারীদের এ বিষয়ক অভিজ্ঞতা কী রকম তা জানতে আমরা তার অভিজ্ঞতা এবং তারা এ বিষয়ে যেসকল বিদ্যমান নীতিমালা সম্পর্কে অবগত আছেন সেই বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করি।

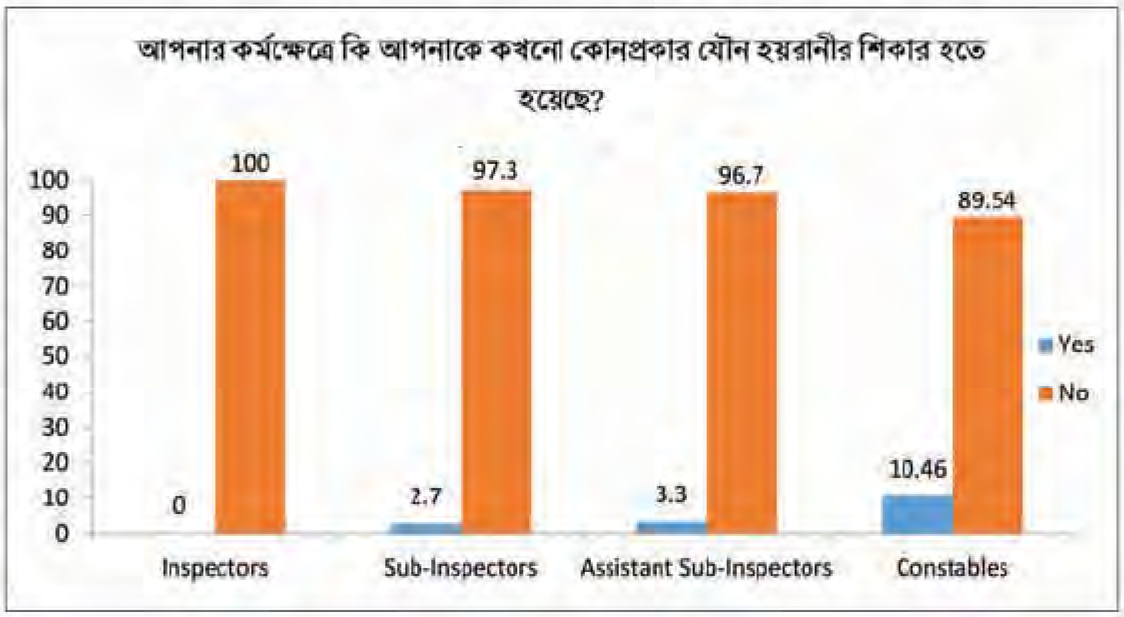

মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে, ২.৭% সাব-ইনস্পেক্টর এবং ৩.৩% অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর জানান যে তাদের যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। ১০% এরও বেশি কনস্টেবল জানান যে তারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

79. বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগে, অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর থেকে সর্বোচ্চ পদের - নারী ও পুরুষ উভয় - কর্মকর্তাদেরকে "স্যার" বলে সম্বোধন করা হয়।

চট্টগ্রামে অংশগ্রহণকারী কনস্টেবলদের ভাষ্যমতে, হয়রানির একটি সাধারণ ধরন হচ্ছে, কোনও একজন নারী পুলিশের মানহানির উদ্দেশ্যে তার সম্পর্কে গুজব ছড়ানো। তারা আরও বলেন, এমনকি কিছু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পর্যন্ত গুজব ছড়ানোতে সম্পৃক্ত হন। পুরুষ পুলিশ সদস্যদের সম্পর্কে আরও অভিযোগ করা হয় যে, তারা নারী পুলিশ সদস্যদের মোবাইলে বারংবার/অথবা অনুচিত ম্যাসেজ (বার্তা) পাঠান এবং নারীদের শার্ট-প্যান্ট ইউনিফর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করেন।

উভয় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং সাক্ষাৎকারে যেসকল নারী স্বীকার করেন যে হয়রানি একটি বিদ্যমান সমস্যা, তারা নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহের কথা উল্লেখ করেন:

"যখন আমরা কোনও স্থানে পোস্টিং পাই, তখন সেইস্থানে পৌঁছানোর আগেই আমাদের একটা বাজে নাম দিয়ে দেওয়া হয়। আমি যদি অভিযোগ করি, তাহলে আমি পুলিশ বিভাগে টিকতে পারবো না"।

তারা এবিষয়ে রিপোর্টিং এর অভাবের কারণ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রাখেন:

"সিনিয়রের কাছে অভিযোগ করে কোনও লাভ হবে না, কারণ আমাদেরকে ভিক্টিমাইজ করা হবে। অভিযোগ করা মানেই হলো নিজেদের ওপরই চাপ বাড়িয়ে দেওয়া। সত্যি বলতে আমরা যদি অভিযোগ করি তবে আমাদেরকে শাস্তি হিসেবে আরও বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়"।

"হয়রানির ঘটনা ঘটে কিন্তু মেয়েরা কিছু বলে না, তারা ভাবে তাদেরকে খারাপ হিসেবে বিবেচনা করা হবে"।

জুনিয়র পদমর্যাদার নারী সদস্যদের ধারণা এই সমস্যাটি সিনিয়র কর্মকর্তাদের চেয়ে তাদের মধ্যেই বেশি:

"ক্যাডার পর্যায়ে যৌন হয়রানি কম। সিনিয়র ক্যাডারদেরকে সম্মান করা হয়। শুধু ক্যাডার পর্যায়ের কর্মকর্তারাই সম্মান পায়"।

সিনিয়র কর্মকর্তারাও মনে করেন যে জুনিয়র পর্যায়ের নারীরা অধিক মাত্রায় যৌন হয়রানির শিকার হন:

"একজন কনস্টেবল হয়তো এর শিকার হতে পারে, কিন্তু ক্যাডার পর্যায়ের কেউ নয়"।

"কনস্টেবল পর্যায়ে এই সমস্যা থাকতে পারে, বিশেষ করে যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে তাদের ক্ষেত্রে"।

যদিও বেশিরভাগ সিনিয়র নারী কর্মকর্তা মনে করেছেন যে তাদের পর্যায়ে হয়রানির ঘটনা ঘটে না, একজন সিনিয়র কর্মকর্তা জানান যে ক্যাডার পর্যায়েও হয়রানির ঘটনা ঘটে। কিন্তু নারীরা তাদের চেয়েও অধিক ক্ষমতাবান সিনিয়রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে দ্বিধা বোধ করেন।

অতএব প্রতীয়মান হয় যে পুলিশ বিভাগে যৌন হয়রানির ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। এই সমস্যাকে আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য অনেক ব্যবস্থাও রয়েছে। তেমনই একটি ব্যবস্থা হলো, ২০০৯ সালের হাইকোর্ট আদেশের বাস্তবায়ন করা, যেখানে প্রতিটি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগ কমিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্ভব হলে প্রতিটি থানাতে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা উচিৎ এবং অবশ্যই প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি কমিটি থাকা উচিৎ, যাতে নারীরা প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পায়। এছাড়াও যৌন হয়রানি এবং এর প্রতিকার, যেমন অভিযোগ কমিটি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রশিক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কখন একটি ঘটনা যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হয় সে সম্পর্কে পুলিশ সদস্যদের পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে এবং এই বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতির কথা তাদেরকে জানাতে হবে। অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

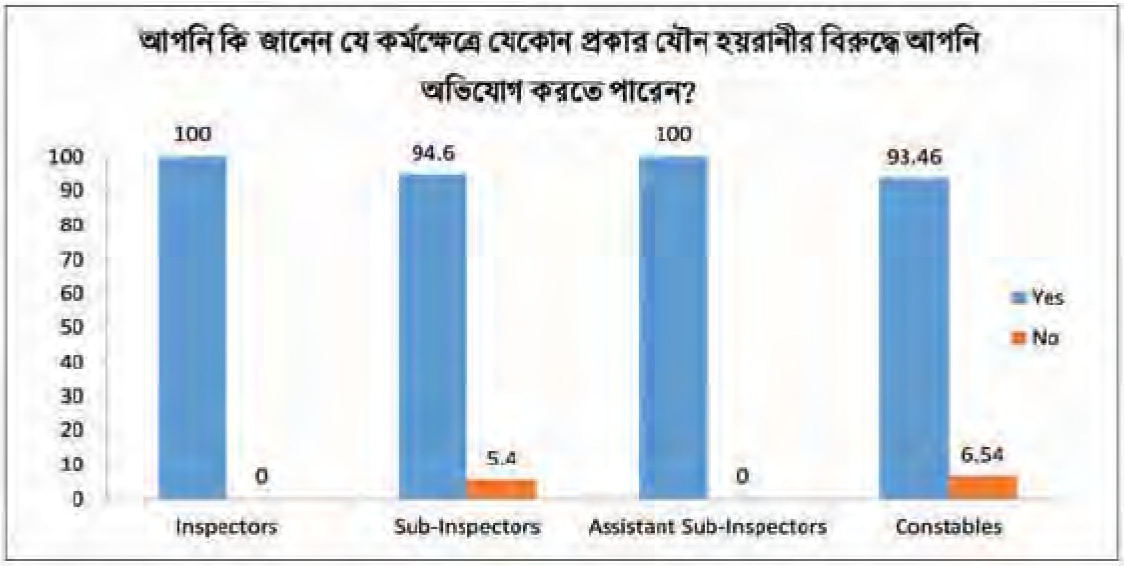

বেশিরভাগ মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কনস্টেবল জানান, তারা যে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন এ বিষয়টি সম্পর্কে তারা অবহিত আছেন, তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। উদ্বেগজনকভাবে চট্টগ্রামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ কনস্টেবল বলেন যে, তারা বিদ্যমান প্রতিকার সম্পর্কে অবগত নন। যৌন হয়রানি সম্পর্কে নারীদের অভিযোগ করার অধিকার, অভিযোগ করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং অভিযোগ পেশ করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে নারীদেরকে অবগত করা অপরিহার্য।

এছাড়াও আরও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বাধা রয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের সময় বেশ কয়েকজন নারী জানান যে, তারা অভিযোগ করতে চান না, কারণ তারা ভয় পান এর ফলে তাদেরকে আরও হয়রানির শিকার হতে হবে। পরামর্শ করার মতো সিনিয়র নারী কর্মকর্তার সংখ্যা কম হওয়ার জন্য এই সমস্যা আরও প্রকট হয়। পুরুষ কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ পেশ করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন তারা। যেসকল ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে যৌন হয়রানির সময় নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করতে নারীদের অপারগতার বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক। প্রাপ্তিসাধ্য প্রতিকারসমূহের প্রতি আস্থার অভাবে নারীরা অভিযোগ করতে অনীহা বোধ করেন। এ সম্পর্কে তারা তাদের মতামত নিম্নরূপে প্রকাশ করলেন:

"৪-৫ বছর আগে একজন পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট একজন নারী অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্টকে তার কক্ষে টেনে নিয়ে যায় এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। পুরুষরা মনে করে যে তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কোথায় অভিযোগ করবো? কে তার চেয়েও অধিক ক্ষমতাধর উর্ধ্বতনের কাছে অভিযোগ করবে? কেউ ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেলের কাছে অভিযোগ করে না। থানা এবং পুলিশ লাইনসমূহে পরিস্থিতি খারাপ। আমরা সব ঘটনার হিসেব রাখতে পারি না। পুরুষ কনস্টেবলরা মিসড কল দেয়। আমি কোনও পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তাকে বিশ্বাস করি না। আমি কোনও কনস্টেবলকে বাসায় ঢুকতে দেই না। আমি দরজা থেকে তার যা বলার তা শুনি এবং তাকে যেতে বলি। যৌন হয়রানির সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে; তবে নারী পুলিশরা এই বিষয়টি সবসময় উত্থাপন করেন না কারণ বিষয়টি পুরুষ পুলিশ কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া হবে। পুলিশ বিভাগে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার পদ্ধতি বিদ্যমান থাকলেও, কে অভিযোগ করবে"?

টি বেশ আশাব্যঞ্জক যে, সকল পদমর্যাদার বেশিরভাগ নারী হাইকোর্টের আদেশ সম্পর্কে অবগত আছেন, তবে অনেক নারী আবার এ সম্পর্কে জানেন না। চট্টগ্রামে এক-পঞ্চমাংশ নারী কোনও না কোনও প্রকারের যৌন হয়রানির শিকার হন বলে জানালেও মাত্র ৩২.২% জানান যে, তারা কোর্টের আদেশটি সম্পর্কে জানেন না।

এছাড়াও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন চলার সময় হাইকোর্টের আদেশটি সম্পর্কে যারা জানেন, তারা বলেন যে, তারা আদেশটি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানেন না। অনেক নারী জানান, তাদের জেলাতে অভিযোগ কমিটি

পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরে যৌন হয়রানি অভিযোগ কমিটি গঠনের বিষয়ে কি আপনি কি অবগত?

গঠিত হয়নি। নারী সদস্যদের সচেতনতার অভাবে শুধু যে তাদের প্রতিকার লাভের সক্ষমতা কমে যায় তাই নয়, অভিযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং কার্যকরি করার জবাবদিহিতাও এতে হ্রাস পায়।

এরপর আমরা যৌন হয়রানির শিকার নারীদের সহযোগিতার জন্য আরেকটি পদ্ধতি, বিডব্লিউপিএন হটলাইন, সম্পর্কে প্রশ্ন করি।

যৌন হয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ থাকা সত্ত্বেও সব থানা এবং অফিসে নারীদের অভিযোগ পেশ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা হয়নি। এছাড়াও যৌন হয়রানি বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক জেন্ডার ও বৈষম্য বিরোধী নীতিমালা প্রণীত না হওয়ায় নারীরা জানেন না যে, উক্ত হয়রানি থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য তারা সহযোগিতা পেতে পারেন।

নারী পুলিশ সদস্যদের কার্যকরি সহযোগিতা প্রদানের জন্য ২০১৩ সালে বিডব্লিউপিএন একটি টেলিফোন হট লাইন চালু করেছে, যেখানে সকল পদমর্যাদার নারী পুলিশ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে পারেন। কোনও জেলায় সঙ্ঘটিত কর্মক্ষেত্রে হয়রানির ঘটনা বিপিডব্লিউএন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত ইউনিটের প্রধানকে অবগত করা হয়।

সম্প্রতি BWPN কর্তৃক যে হেল্পলাইন নম্বরটি চালু করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে কি আপনি অবগত?

মধ্য পর্যায়ের সম্পূর্ণ ১০০% কর্মকর্তা বিডব্লিউপিএন হট লাইনের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত বলে জানান, যা বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। চট্টগ্রামে আমাদের অনুষ্ঠানের পূর্বে বিডব্লিউপিএন একটি কর্মশালা আয়োজন করে[80], সুতরাং

80. এই কর্মশালাটি শুধুমাত্র চট্টগ্রামে পরিচালনা করা হয়; তাই ঢাকা এবং সিলেটের অন্য দুটি সেশনে এরকম কোন প্রভাব ছিল না।

প্রাপ্ত তথ্য উত্তরদাতাদের সচেতনতার প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে। তবুও এটি উৎসাহব্যঞ্জক এই কারণ যে, অন্যান্য জেলার মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যেও একই মাত্রার সচেতনতা পাওয়া যায়।

কনস্টেবলদের মধ্যেও উচ্চমাত্রার সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র ৮.৫% হটলাইন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তবে চট্টগ্রামের কনস্টেবলদের এক-পঞ্চমাংশ বলেন, তারা এই হটলাইন সম্পর্কে অবগত নন। আমাদের অনুষ্ঠানের আগে বিপিডব্লিউএন চট্টগ্রামে একটি কর্মশালা পরিচালনা করা সত্ত্বেও এতো কম মাত্রার সচেতনতা বেশ বিস্ময়কর। এমনও হতে পারে, অংশগ্রহণকারীরা উক্ত অনুষ্ঠানের পূর্বে তাদের যে জ্ঞান ছিল তার ভিত্তিতে উত্তর দিয়েছেন। তারপরও যে স্থানে যৌন হয়রানির অভিযোগ এতো বেশী পাওয়া যায়, সেইস্থানে সহজসাধ্য প্রতিকার সম্পর্কে এতো কম মাত্রার সচেতনতার বিষয়টি বেশ উদ্বেগজনক।

এরপর আমরা কনস্টেবলদেরকে জিজ্ঞাসা করি, তারা বিডব্লিউপিএন এর সদস্য কিনা। যদিও সকল নারী পুলিশ সদস্যই নিয়োগের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিডব্লিউপিএন এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তবুও এমন একটি নেটওয়ার্ক এর অস্তিত্ব এবং এতে তার সদস্যপদ সম্পর্কে তাদের অবগত থাকাটা জরুরি। বিডব্লিউপিএন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এই নেটওয়ার্কটির কার্যক্রম এবং এর সদস্য হিসেবে নারীদের অধিকারগুলো সম্পর্কে প্রতিটি নারী পুলিশকে জানানোর দায়িত্ব বিডব্লিউপিএন এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। এর কারণে নারী পুলিশদের মধ্যে এ সংক্রান্ত সচেতনতা সম্পর্কে জানতে আমরা প্রচেষ্টা চালাই।

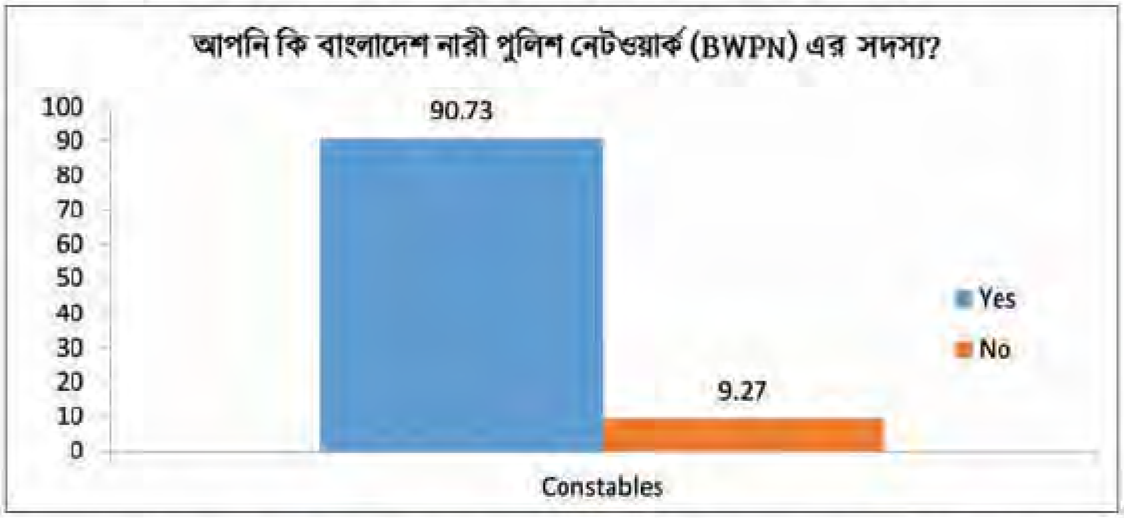

৯০% এরও বেশি কনস্টেবল জানান যে তারা বিডব্লিউপিএন এর সদস্য। তবে চট্টগ্রাম রেঞ্জ এর ফলাফল অন্যগুলির চেয়ে বেশ আলাদা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। সেখানে ৩৫.৪৮% উত্তরদাতা বলেন, তারা বিডব্লিউপিএন এর সদস্য নন। সচেতনতার ক্ষেত্রে এই উচ্চ আনুপাতিক ব্যবধান বেশ উদ্বেগজনক, কারণ এই স্থানের নারী পুলিশ সদস্যরাই জেন্ডার পক্ষপাতিত্বের কথা বারংবার উল্লেখ করেছিলেন[৪১]।

নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন নারী পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণের সময় বিডব্লিউপিএন পরিচিতিমূলক ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা যাবে যে নারীরা পুলিশ বিভাগে যোগদান করার সাথে সাথেই বিডব্লিউপিএন সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং এই নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ ব্যবহার করছেন। এর ফলে পুলিশ বিভাগে যোগদানকৃত নারীদের নিজেদের অধিকার এবং সুযোগসমূহ সম্পর্কেও সচেতনতা সৃষ্টি হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নের জন্য সকল সদস্যদের নিয়মিত সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করা উচিৎ। একই সাথে বিডব্লিউপিএন যে নারীদের সহযোগিতা দেওয়ার লক্ষ্যে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক, সেই সম্পর্কে নারীদেরকে ধারণা দেওয়া উচিৎ।

৪১. উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের সকল অংশগ্রহণকারী চট্টগ্রাম রেঞ্জ থেকে ছিলেন না। ফলে দৃঢ় উপসংহারে পৌঁছানো যাচ্ছে না। কিন্তু এটি ইঙ্গিত করে যে, এই বিষয়ে অবশ্যই নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

উপসংহার এবং সুপারিশ

পুলিশ বাহিনীতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগ বেশ সচেতন এবং সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এটি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জেন্ডার সমতার অভাব সম্পর্কে সরকার এবং পুলিশ বিভাগের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোযোগ প্রদান করা হচ্ছে। জেন্ডার ও বৈষম্য বিরোধী নীতিমালার এযাবৎ যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা প্রমাণ করে যেসকল বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা পুলিশের নারীদের অন্তর্ভুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করতো তা দূর করতে বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

জরিপের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, নারীদেরকে পুলিশ বাহিনীতে পুরুষদের সমান একাঙ্গিভুত করে নিতে আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য ন্যায়, সমতা ও নারীদের প্রয়োজনকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ অপরিহার্য। এই প্রচেষ্টাসমূহকে নারীদের আংশিক অংশগ্রহণ নয়, বরং সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

জরিপে অবশ্যই অনেক ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে, যেমন নারীরা মনে করেন যে, পুলিশ বিভাগ নারীদের কাজ করার জন্য একটি উত্তম স্থান; তারা তাদের কর্তব্য, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকারের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং তারা মনে করেন যে, পুলিশের কাজ একটি অপরিহার্য জনসেবা; সাম্য, স্বাধীনতা এবং পেশাদারিত্বের প্রতি তাদের দৃঢ় অবস্থান ইত্যাদি।

তবে এসকল ইতিবাচক তথ্যের চেয়ে নারীরা যেসকল প্রতিবন্ধকতার শিকার হন তার সংখ্যা অনেক বেশি। সিনিয়র পদসমূহে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এখনও অনেক কম। নেতৃত্ব এবং মাঠ পর্যায়ের ব্যবহারিক ভূমিকা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হয়। তাদেরকে গুরুতর পুলিশি দায়িত্ব দেওয়া হয় না। অনেকেই যৌন হয়রানির শিকার হলেও অভিযোগ দায়ের করা হয় না; এ সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ প্রতিকারসমূহও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নারী পুলিশ সদস্যদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে পুরুষ কর্মকর্তাগণ সচেতন নন অথবা এ সম্পর্কে তারা সংবেদনশীল নন; এবং পর্যাপ্ত জেন্ডার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। পৃথক টয়লেট, পোশাক পরিবর্তনের কক্ষ, ব্যারাক এবং শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের মতো অবকাঠামো এবং সুবিধাসমূহের অভাব বিদ্যমান।

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের উচিৎ একটি পূর্ণাঙ্গ জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়নকে অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনা করা, যেই নীতিমালায় সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়, পরিবীক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করণের সাথে সম্পর্কিত থাকবে। পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রতি আরও কিছু সুপারিশ নিম্নে বর্ণিত হলো:

সুপারিশ সমূহ

বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের প্রতি

১। পরবর্তী কৌশলগত পরিকল্পনায় জেন্ডার এর বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ডসহ একটি মৌলিক কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে পুনঃ-অন্তর্ভুক্ত করা।

২। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে এটি গতিশীল এবং শক্তিশালী জেন্ডার নীতিমালা গ্রহণ করা:

- যেসকল কর্মপরিকল্পনা এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা
- পুলিশের পুরুষ ও নারী নেতৃত্বকে সম্পৃক্ত করা।

৩। নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি চলমান রাখা:

- ক্যাডার ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে আরও বেশিসংখ্যক নারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ
- সাব-ইনস্পেক্টর এবং কনস্টেবল পর্যায়ের নির্ধারিত ১৫% কোটা পূরণ নিশ্চিত করতে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন বিজ্ঞাপন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো
- শুধু স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং আরও দূরবর্তী এবং দুর্গম এলাকা এবং জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে কাজ করা
- গণমাধ্যম এবং প্রথাগত মাধ্যম ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা।

৪। নারী এবং তাদের ভূমিকার প্রতি আরও বন্ধুসুলভ সংস্কৃতি নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা নেয়া, যেমন:

- জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি
- নীতিমালা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি (হয়তো নির্দিষ্ট কোটা প্রণয়নের মাধ্যমে)
- সিনিয়র নারী কর্মকর্তাদের আদেশ মান্য না করাকে শৃঙ্খলা অমান্য করা হিসেবে বিবেচনা করা
- নারীদের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ এবং পদোন্নতি বিষয়ে বিবেচনা করা

৫। যৌন হয়রানি বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করা।

৬। সরকারি ব্যয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোগত কর্মসূচি হাতে নেয়া যাতে প্রতিটি থানা এবং জেলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়:

- নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট
- পৃথক বিশ্রাম কক্ষ অথবা পোশাক পরিবর্তনের জন্য কক্ষ
- যানবাহন
- আবাসন
- দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র

৭। সুনির্দিষ্ট কর্মঘন্টা এবং শিফট প্রণয়নের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করা যেখানে শনাক্তকৃত নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনা করা হবে:

- জেলার প্রধানসহ, মাঠ পর্যায়ের পোস্টিং এবং নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিশ্চিত করা
- তদন্তমূলক ভূমিকা
- নারী ও শিশুবিষয়ক মামলা ছাড়াও অন্যান্য গুরুতর মামলার দায়িত্ব প্রদান

৯। এর সাথে সম্পর্ক রেখে একটি অডিট পরিচালনা করা এবং নারীদের চাকরিরত অবস্থায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা:

- যাতে তারা পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্তব্য পালন করতে পারেন
- যা তাদের সক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে, কারণ বর্তমানে হয়তো নারীরা এর অভাব বোধ করেন
- যেখানে নারীদের শনাক্তকৃত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে; যেমন, গাড়ি চালানো, কম্পিউটার, তদন্ত, ইংরেজি ভাষা এবং সাইবার অপরাধ, ইত্যাদি।

১০। আইন এবং প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উন্নয়ন সাধন এবং শক্তিশালীকরণ।

১১। স্বচ্ছতা, লক্ষ্য এবং মেধাভিত্তিক পদোন্নতি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যেখানে নিম্নলিখিত চর্চা সমূহ বিদ্যমান থাকবে:

- নারীদেরকে পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন যোগ্যতা নির্ধারণ, মূল্যায়ন প্যানেল, ইত্যাদি।
- সর্বনিম্ন পদ থেকে পদোন্নতির কথা বিবেচনায় রেখে, বর্ধিত সংখ্যক নারীর পদোন্নতির জন্য কিছু সাময়িক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত রাখা।

১২। বিডব্লিউপিএন এর কথা বিবেচনায় রাখা এবং বাজেট বরাদ্দ দেয়া।

সরকারের প্রতি:

১। পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি গ্রহণ:

- ২০০৭ সালের পুলিশ অর্ডিন্যান্স এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুলিশ ব্যবস্থার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন, যেখানে বৈচিত্র্য এবং পর্যাপ্ত নারী প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকবে
- পিআরপি এর সাথে সম্পূর্ণরূপে এবং অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত হওয়া
- প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সম্পদ করা এবং এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা।

২। একটি আইন প্রণয়ন করা যা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করবে:

- যা যৌন হয়রানির জন্য যথাযথ শাস্তি এবং জিরো টলারেন্স (অনাপোষি) বিধান প্রদান করবে
- যা যথাযথ জেন্ডার ভারসাম্যসহ অন্যান্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে
- যা আইন অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বিধান প্রদান করবে
- অভিযোগকারীর ভিক্টিমাইজেশন প্রতিরোধ করতে বিধান প্রদান করবে

৩। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ পুলিশকে পর্যাপ্ত সম্পদ প্রদান করা:

- থানায় নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট
- নারীদের বিশ্রাম ও পোশাক পরিবর্তনের ব্যবস্থা
- নারী (এবং অবশ্যই অন্যান্য) কর্মকর্তাদের জন্য আবাসন
- নারী কর্মকর্তাদের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা
- দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র
- পুলিশের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যয়।

৪। বিডব্লিউপিএন এর বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করা

৫। আরও অধিকসংখ্যক নারীকে নেতৃত্বমূলক পদে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তাদেরকে সক্ষম হিসেবে গড়ে তুলতে ক্যাডার পর্যায়ে নারীদের জন্য কোটা বৃদ্ধি করা। ক্যাডার পর্যায়ে ১০% নারী কোটা পূরণ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্ক (বিডব্লিউপিএন) এর প্রতি

১। হটলাইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি চলমান রাখা এবং যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হটলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে নারীদেরকে উৎসাহিত করা।

২। যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রক্রিয়ায় বিডব্লিউপিএন ভিক্টিমদেরকে সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

৩। বিদ্যমান ধারা ও সমস্যা সনাক্ত করার জন্য হটলাইন এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য মনিটর করা।

৪। নিয়োগপ্রাপ্ত নারীদের প্রশিক্ষণে পরিচিতিমূলক সেশন পরিচালনা করা।

৫। নেটওয়ার্ককে আরও প্রসারিত এবং সংহত করা।

৬। এএসআই, এসআই এবং কনস্টেবল পর্যায়ে নিয়মিত নারী নিয়োগ নিশ্চিত করতে পুলিশ সদরদপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে সহযোগিতা করা।

৭। সদর দপ্তর/ইউনিট/ব্যাটেলিয়ন/জেলা এবং থানায় নারীদের কর্তৃত্ব পর্যালোচনা করা।

৮। সকল পদ, জেলা এবং ইউনিট অনুসারে নারী সদস্যদের একটি ডাটাবেজ/তথ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করা।

৯। ক্যাডার ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি করা।

১০। থানা, জেলা পুলিশ এবং সদর দপ্তরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নিশ্চিত করতে তহবিল এবং সম্পদ বরাদ্দ করার জন্য সরকারের সাথে অ্যাডভোকেসি করা।

১১। জুনিয়র এবং মধ্যবর্তী পর্যায়ের নারী পুলিশদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তদন্ত, আইন ও প্রক্রিয়া, সাইবার অপরাধ, গাড়ি চালানো, ইংরেজি ভাষায় কথা বলা এবং কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১২। পোস্টিং ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেন যোগ্য ও দক্ষ নারীরা বৈষম্যের শিকার না হন তা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগের সাথে অ্যাডভোকেসি করা।

১৩। নারী পুলিশদের দক্ষতা এবং মেধার ভিত্তিতে তাদেরকে পুলিশের সব রকমের কাজে নিয়োজিত করার জন্য পুলিশ বিভাগের সাথে অ্যাডভোকেসি করা।

১৪। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত থেকে শুরু করে সিনিয়র পর্যায় পর্যন্ত পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য জেন্ডার সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা, বিশেষ করে কোন কোন কাজের অযথার্থ ব্যবহার, জেন্ডারভিত্তিক পক্ষপাতিত্ব এবং যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত হয় সেই বিষয়ে।

১৫। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বাস্তবায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ।

১৬। বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম, যেমন, রেডিও, টিভি এবং পত্রিকার মাধ্যমে দূরবর্তী এলাকাসমূহে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার।

ইউএনডিপি এর পুলিশ রিফর্ম প্রোগ্রাম এর প্রতি

১। রিফর্ম প্রোগ্রাম এর পরবর্তী পর্যায়ে (যদি এমন হয়) জেন্ডার বিষয়ক কর্মসূচি বিদ্যমান রাখা।

২। পুলিশের সাথে কাজ করে একটি জেন্ডার নীতিমালা প্রস্তুত করা:

- যা শক্তিশালী ও গতিশীল
- যা সবচেয়ে সিনিয়র পর্যায়ের সমর্থনপুষ্ট এবং সাক্ষর-কৃত
- যা বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা হবে
- যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমা, লক্ষ্যমাত্রা, পরিবীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাসহ কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশিত থাকবে।

৩। বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্ককে আর্থিক সহায়তাসহ দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

পরিশিষ্ট

কনস্টেবলদের জন্য প্রশ্নমালা

পুলিশ ব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক এই জরিপটি পরিচালনা করা হচ্ছে। আমরা আপনাদের উত্তর সমূহ এবং আপনাদের পরিচয় গোপন রাখবো। এই জরিপে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নাম	
বয়স/জন্মতারিখ	
পদবী	
বৈবাহিক অবস্থা	
চাকরির মেয়াদ/ কত বছর যাবত এই চাকরিতে আছেন?	
থানা	

অনুগ্রহ পূর্বক প্রশ্নমালাটি পূরণ করুন/আপনার যথোপযুক্ত পছন্দের উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১। আপনি কেন পুলিশ বিভাগে যোগদান করলেন?

____

____

____

২। আপনার পরিবার কি আপনার পুলিশ বিভাগে যোগদানকে সমর্থন করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। তারা কি আপনার পুলিশ বিভাগে চাকরি করার বিষয়টি পছন্দ করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। পুলিশ বিভাগের এই চাকরিতে আপনার প্রধান কাজ কি কি?

____

____

____

৫। আপনি প্রতিদিন কত ঘণ্টা কাজ করেন?

৮ ঘণ্টা ☐

৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ☐

১২ ঘণ্টার বেশি ☐

৬। আপনার কি মনে হয় যে আপনার সাথে আপনার পুরুষ সহকর্মিদের মতোই সমান আচরণ করা হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। সবসময় ডিউটিতে থাকা কি অনেক কঠিন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। পুলিশ বিভাগ কি নারীদের কাজ করার জন্য একটি ভালো জায়গা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। পুলিশ বিভাগ কি এমন কোনো নীতিমালা তৈরি করেছে বা সুবিধা প্রদান করেছে যা নারীদের পুলিশ বিভাগে কাজকে সহজ করে দেয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে সেই নীতিমালা বা সুবিধাগুলো কী কী? এবং এগুলো কীভাবে আপনাকে সাহায্য করে?

____

____

____

১১। থানাতে নারী পুলিশদের জন্য কি পৃথক শৌচাগার (Toilet) এবং বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১২। নিজস্ব জেলা থেকে দূরে নিয়োগপ্রাপ্ত/কর্মরত নারী পুলিশদের জন্য কি পৃথক ব্যারাক/পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৩। পুলিশের চাকরিতে আইন এবং আইনি কার্যবিধি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আপনার কি মনে হয় যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি এই জ্ঞান পান?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৪। আপনি কি মাঠ-পর্যায়ে ডিউটি করতে পছন্দ করেন, নাকি টেবিল চেয়ারে বসে?

মাঠ-পর্যায়ে ☐

টেবিল-চেয়ারে বসে ☐

উভয় ☐

১৫। আপনার প্রশিক্ষণে কি জেন্ডার/লিঙ্গ বিষয়ক সচেতনতামূলক নির্দ্দিষ্ট অধ্যায় থাকে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৬। উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, আপনি কি মনে করেন যে এই প্রশিক্ষণ কার্যকরি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৭। পুরুষ এবং নারী পুলিশদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার মধ্যে কি কোন পার্থক্য (***) রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৮। আপনার জানা মতে বেশিরভাগ নারী কনস্টেবল সবচেয়ে উচ্চ কোন পদ পর্যন্ত যেতে পারে?

____

____

____

১৯। আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানে কি কখনো কোনপ্রকার যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। আপনি কি জানেন যে কর্মক্ষেত্রে যে কোন প্রকার যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ করতে পারেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২১। সম্প্রতি BWPN কর্তৃক যে হটলাইন নম্বরটি চালু করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে কি আপনি অবগত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২২। প্রতিটি থানায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল গঠনের জন্য হাইকোর্টের আদেশটির বিষয়ে কি আপনি অবগত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৩। আপনি কি বাংলাদেশ নারী পুলিশ নেটওয়ার্ক (BWPN) এর সদস্য?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৪। আপনি কি মনে করেন যে পুলিশ বিভাগে আরও নারী পুলিশ নিয়োগ করা প্রয়োজন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৫। সকল পুলিশ সদস্যদেরকেই কি শিথিল-যোগ্য কর্মঘন্টা প্রদান করা উচিৎ?

না, শুধু নারী পুলিশ সদস্যদের ☐

না, শুধু পুরুষ পুলিশ সদস্যদের ☐

হ্যাঁ, প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদেরকেই ☐

২৬। আপনি কি মনে করেন যে প্রতিটি থানাতে নারীদের জন্য একটি বিশেষ হেল্প-ডেস্ক প্রয়োজন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৭। আপনার চাকরির কোন অংশটি আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন?

১।

২।

৩।

২৮। কী কী কাজ করা হলে আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন?

১।

২।

৩।

২৯। আপনি কি মনে করেন যে একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ পেশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩০। আপনি কি মনে করেন যে আপনার ইউনিফর্ম (পোশাক) আপনাকে পুরুষ পুলিশদের চেয়ে:

কম কর্তৃত্ব প্রদান করে? ☐

বেশি কর্তৃত্ব প্রদান করে? ☐

সমান কর্তৃত্ব প্রদান করে? ☐

৩১। আপনি কি মনে করেন যে সাধারণ মানুষ নারী পুলিশদেরকে পুরুষ পুলিশদের চেয়ে:

সমান সম্মান করে? ☐

কম সম্মান করে? ☐

বেশি সম্মান করে? ☐

ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টরদের জন্য প্রশ্নমালা

পুলিশ ব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক এই জরিপটি পরিচালনা করা হচ্ছে। আমরা আপনাদের উত্তরসমূহ এবং আপনাদের পরিচয় গোপন রাখবো। এই জরিপে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নাম	
বয়স/জন্মতারিখ	
পদবী	
বৈবাহিক অবস্থা	
চাকরির মেয়াদ/ কত বছর যাবত এই চাকরিতে আছেন?	
থানা	

অনুগ্রহপূর্বক প্রশ্নমালাটি পূরণ করুন/আপনার যথোপযুক্ত পছন্দের উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

১। আপনি কেন পুলিশ বিভাগে যোগদান করলেন?

____

____

____

২। আপনার পরিবার কি আপনার পুলিশ বিভাগে যোগদানকে সমর্থন করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩। তারা কি আপনার পুলিশ বিভাগে চাকরি করার বিষয়টি পছন্দ করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। পুলিশ বিভাগের এই চাকরিতে আপনার প্রধান কাজ কি কি?

____

____

____

৫। আপনি প্রতিদিন কত ঘণ্টা কাজ করেন?

৮ ঘণ্টা ☐

৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ☐

১২ ঘণ্টার বেশি ☐

৬। আপনার কি মনে হয় যে আপনার সাথে আপনার পুরুষ সহকর্মিদের মতোই সমান আচরণ করা হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭। সবসময় ডিউটিতে থাকা কি অনেক কঠিন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। পুলিশ বিভাগ কি নারীদের কাজ করার জন্য একটি ভালো জায়গা?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯। পুলিশ বিভাগ কি এমন কোনো নীতিমালা তৈরি করেছে বা সুবিধা প্রদান করেছে যা নারীদের পুলিশ বিভাগে কাজকে সহজ করে দেয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১০। উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয় তবে সেই নীতিমালা বা সুবিধাগুলো কী কী? এবং এগুলো কীভাবে আপনাকে সাহায্য করে?

____

____

____

১১। থানাতে নারী পুলিশদের জন্য কি পৃথক শৌচাগার (Toilet) এবং বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১২। নিজস্ব জেলা থেকে দূরে নিয়োগপ্রাপ্ত/কর্মরত নারী পুলিশদের জন্য কি পৃথক ব্যারাক/পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৩। পুলিশের চাকরিতে আইন এবং আইনি কার্যবিধি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আপনার কি মনে হয় যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি এই জ্ঞান পান?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৪। আপনাকে কি শুধু নারী বিষয়ক মামলাসমূহের দায়িত্ব প্রদান না করে সংবেদনশীল এবং গুরুতর মামলার দায়িত্ব প্রদান করা হয়?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৫। আপনার অধীনে কর্মরত পুরুষ পুলিশ সদস্যরা কি স্বেচ্ছায় আপনার নির্দেশ পালন করেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৬। আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কি আপনাকে অন্যান্য পুরুষ SI এবং Inspector দের সমান গুরুত্ব প্রদান করে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৭। আপনার প্রশিক্ষণে কি জেন্ডার/লিঙ্গ বিষয়ক সচেতনতামূলক নির্দিষ্ট অধ্যায় থাকে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৮। উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, আপনি কি মনে করেন যে এই প্রশিক্ষণ কার্যকরি?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৯। পুরুষ এবং নারী পুলিশদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার মধ্যে কি কোন পার্থক্য (***) রয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২০। আপনি যেখানে কাজ করেন সেখানে কি কখনো কোনপ্রকার যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছে?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২১। আপনি কি জানেন যে কর্মক্ষেত্রে যেকোনো প্রকার যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ করতে পারেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২২। সম্প্রতি BWPN কর্তৃক যে হট লাইন নম্বরটি চালু করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে কি আপনি অবগত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৩। প্রতিটি থানায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল গঠনের জন্য হাইকোর্টের আদেশটির বিষয়ে কি আপনি অবগত?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৪। আপনি কি মনে করেন যে পুলিশ বিভাগে আরও নারী পুলিশ নিয়োগ করা প্রয়োজন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৫। সকল পুলিশ সদস্যদেরকেই কি শিথিল-যোগ্য কর্মঘন্টা প্রদান করা উচিৎ?

না, শুধু নারী পুলিশ সদস্যদের ☐

না, শুধু পুরুষ পুলিশ সদস্যদের ☐

হ্যাঁ, প্রত্যেক পুলিশ সদস্যদেরকেই ☐

২৬। আপনি কি মনে করেন যে প্রতিটি থানাতে নারীদের জন্য একটি বিশেষ হেল্প-ডেস্ক প্রয়োজন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

২৭। আপনার চাকরির কোন অংশটি আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন?

১।

২।

৩।

২৮। কী কী কাজ করা হলে আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন?

১।

২।

৩।

২৯। আপনি কি এমন কোন থানাতে কাজ করতে পছন্দ করবেন যেখানে সবাই নারী পুলিশ?

হ্যাঁ ☐ না ☐

৩০। আপনার কি মনে হয় যে নারী পুলিশ সদস্যদের কাছে অভিযোগ পেশ করা আরেকজন নারী সদস্যদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর হয়?

৩১। আপনি কি মনে করেন যে আপনার ইউনিফর্ম (পোশাক) আপনাকে পুরুষ পুলিশদের চেয়ে:

কম কর্তৃত্ব প্রদান করে? ☐

বেশি কর্তৃত্ব প্রদান করে? ☐

সমান কর্তৃত্ব প্রদান করে? ☐

৩২। আপনি কি মনে করেন যে সাধারণ মানুষ নারী পুলিশদেরকে পুরুষ পুলিশদের চেয়ে:

সমান সম্মান করে? ☐

কম সম্মান করে? ☐

বেশি সম্মান করে? ☐

সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নমালা:

১) আপনার কেন মনে হয় যে নারীদের পুলিশ বিভাগের কাজে এ সক্রিয় হওয়া জরুরি। পুলিশ বিভাগের কাজে নারীরা কি ধরনের নির্দ্দিষ্ট অবদান রাখতে পারে?

২) আপনার মতে পুলিশে নারীদের প্রতিনিধিত্ব এতো কম হওয়ার কারণগুলো কী কী?

৩) পুলিশ বাহিনীতে আপনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারীরা পুলিশ বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে কী কী বিশেষ বাধার মুখোমুখি হন? যদি বাধার সম্মুখীন হয় তাহলে সেগুলো কী কী?

৪) আপনি কি মনে করেন যে পুলিশের চাকরিতে পুরুষদের প্রাধান্য দেওয়ার সংস্কৃতি বিরাজমান?

৫) নিয়োগ এবং অধিষ্ঠান প্রক্রিয়ার কোনও দিক কি নারীর জন্য বাধা হিসেবে কাজ করে? যদি বাধা হিসেবে কাজ করে থাকে তাহলে সেই দিকগুলো কী কী এবং সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে?

৬) কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি কি পরিমাণ প্রকট সমস্যা হিসেবে বিবেচিত? কর্মক্ষেত্রে কি এর নীতি/কর্মপন্থাসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয় বা যৌন-হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পর্যাপ্তভাবে মোকাবেলা করা হয়?

৭) আপনার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে মানবসম্পদ নীতি/কর্মপন্থাসমূহ এবং সুযোগ-সুবিধাসমূহ, যেমন, গর্ভধারণ ও মাতৃত্বকালীন ছুটি, পোশাক (ইউনিফর্ম), ডে-কেয়ার, সুবিধাজনক কর্ম-ঘণ্টা, নারীদের জন্য পৃথক স্থান সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়সমূহ নারীদের জন্য কি উপযুক্ত?

৮) আপনি কি মনে করেন পুলিশ বাহিনীতে এমন কিছু নির্দ্দিষ্ট ধরনের কার্যভার ও নিয়োজন প্রচলিত রয়েছে যেগুলো নারীদের জন্য উপযুক্ত নয়, অথবা আপনি কি মনে করেন নারীদের পুলিশ বাহিনীর সকল ক্ষেত্রে কাজ করতে দেওয়া উচিত? সকল ক্ষেত্রে কাজ করার পথে কী কী বাধা রয়েছে?

৯) আমরা পুলিশ বাহিনীতে নারীদের বহাল থাকার অবস্থান নিরূপণ করার জন্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করছি, বিশেষ করে নারীদের পুলিশ বাহিনীতে প্রবেশ থেকে প্রশিক্ষণ এবং স্নাতক ডিগ্রী লাভ পর্যন্ত। পুলিশ বাহিনীতে নারীদের বহাল থাকার বিষয়টিকে কি আপনি একটি সমস্যা মনে করেন? যদি সমস্যা মনে করে থাকেন, তাহলে কেন মনে করেন? কাজে বহাল থাকা কি অন্য কোনও ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে কাজ করে (যেমন, শিশুপ্রসব পরবর্তী সময়ে)? আপনার মতে এ বিষয়ে কি করণীয়?

১০) আপনার মতে পুলিশের জ্যেষ্ঠ পদসমূহে নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম কেন?

১১) জ্যেষ্ঠ পদসমূহে নারীদের অধিষ্ঠিত হওয়া বা পদোন্নতিতে কোন বাধা রয়েছে কি? যদি থেকে থাকে তাহলে বাধাসমুহ কী কী? সংস্থায় নারীদের অগ্রগতিকে পৃষ্ঠপোষকতা দানের উদ্দেশ্যে কোনো প্রশিক্ষণ, সহায়তা এবং সহায়কের (রিসোর্স) ব্যবস্থা রয়েছে কি? বিশেষত কোন বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রয়েছে কি?

১২) সরকার এবং/অথবা পুলিশ বাহিনী পুলিশে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে কি করছে? পুলিশ বাহিনী কি এই কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রস্তুত? আপনার মতে এক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন আনা হবে?

১৩) সকল নারী অধ্যুষিত পুলিশ স্টেশন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী? আপনার কি মনে হয় মহিলা-পুলিশ স্টেশন সমূহে ও কিছু নির্দিষ্ট পদে নারী পুলিশ অফিসারদের বিচ্ছিন্ন/সীমাবদ্ধ করে রাখার ঝুঁকি রয়েছে?

১৪) সাধারণভাবে পুলিশ বাহিনীতে নারীদের সুযোগ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা প্রদানে কী করা যেতে পারে? আপনার মতে এই গবেষণা কী ধরনের সুপারিশ উপস্থাপন করলে তা কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে?

বাংলাদেশ পুলিশ এর পদমর্যাদাসমূহ

বাংলাদেশ পুলিশ এর কাঠামো

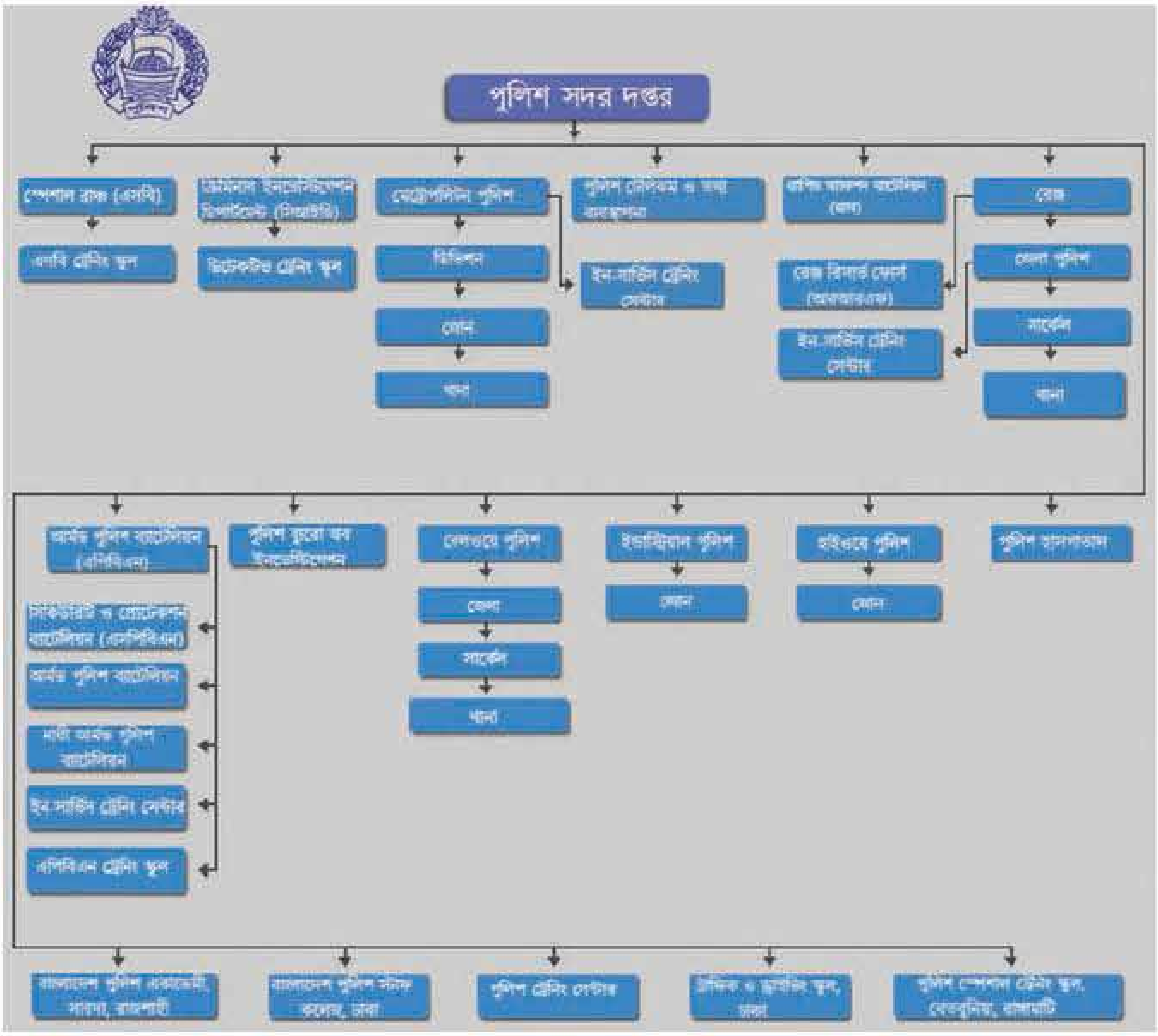

সিএইচআরআই এর কর্মসূচিসমূহ

সিএইচআরআই এর কর্মকাণ্ড একটি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তাহলো মানুষের জীবনে মানবাধিকার, প্রকৃত গণতন্ত্র এবং উন্নয়নকে বাস্তবতায় রূপান্তরিত করতে হলে কমনওয়েলথ এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জবাবদিহিতার জন্য একটি উন্নত এবং কার্যকরি ব্যবস্থা এবং অংশগ্রহণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে সিএইচআরআই মানবাধিকার, ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক কৌশলগত উদ্যোগ এবং অ্যাডভোকেসি চলমান রেখেছে। গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালা, তথ্য প্রচার এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হয়।

ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার

পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কার: অনেক বেশিসংখ্যক দেশে পুলিশ বাহিনীকে জনগণের অধিকারের রক্ষক হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্রের একটি নিপীড়নকারী যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ন্যায়বিচারহীনতা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সিএইচআরআই পদ্ধতিগত সংস্কারকে উৎসাহিত করে, যাতে পুলিশ বাহিনী বিদ্যমান সরকারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ভারতে সিএইচআরআই কর্মসূচি পুলিশ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে। পূর্ব আফ্রিকা এবং ঘানাতে সিএইচআরআই পুলিশের জবাবদিহিতা এবং পুলিশ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিষয়ে গবেষণা করছে।

কারা ব্যবস্থা সংস্কার: সিএইচআরআই এর লক্ষ্য হলো প্রথাগতভাবে বন্ধ ব্যবস্থাসমূহের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা এবং অনুচিত চর্চা সমূহকে উন্মোচন করা। এই কর্মসূচির একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো আইনি ব্যবস্থার যেসকল ব্যর্থতার জন্য কারাগারে জনবিস্ফোরণ ঘটছে, বিচার-পূর্ব বন্দীদশা দীর্ঘায়িত হচ্ছে, অতিরিক্ত সময় বন্দী থাকতে হচ্ছে তা তুলে ধরা এবং এর প্রতিকার কল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আরেকটি লক্ষ্য হচ্ছে, কারাগারের তদারকি ব্যবস্থার পুনঃ-জাগরণ। আমরা বিশ্বাস করি যে এসকল বিষয়ে মনোনিবেশ করলে কারা প্রশাসনের উন্নতি হবে এবং সার্বিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

সিএইচআরআইকে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহে তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মরত সংগঠন সমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর কর্মসূচিগুলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়নে উৎসাহিত করে। আমরা নিয়মিত আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা প্রদান করে থাকি এবং আমরা বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ এবং ঘানাতে তথ্য অধিকারের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। এসকল দেশে আমরা জোটের সচিবালয় হিসেবে কাজ করি। আইন প্রণয়ন এবং তার প্রথম বাস্তবায়নের সময় আমরা সরকার এবং সুশীল সমাজে উত্তম চর্চাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিয়মিত নতুন বিলসমূহের গঠনমূলক সমালোচনা করি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। বিভিন্ন বৈরী পরিবেশে এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপটে সিএইচআরআই এর কাজের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে, যেসকল দেশ তথ্য অধিকার বিষয়ক নতুন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে চাইছে তাদেরকে সিএইচআরআই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করতে পারে। যেমন ঘানাতে আমরা আইনে নিশ্চিত-কৃত তথ্য অধিকারের মূল্য সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছি এবং একই সাথে একটি আধুনিক ও কার্যকরি আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করেছি। ঘানাতে যখন তথ্য অধিকার আইনটি প্রণয়ন করা হলো তখন মানুষকে এই আইনটি সম্পর্কে জানাতে এবং একই সাথে এই আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করতে আমরা কাজ করেছি। এই আইনটি যাতে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান, বিশেষত পুলিশ ব্যবস্থা এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেতে ব্যবহৃত হতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করেছি।

কৌশলগত উদ্যোগ কর্মসূচি

সিএইচআরআই কমনওয়েলথ এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং এর লঙ্ঘন হলে মানবাধিকার বিষয়ক অ্যাডভোকেসি করে। কমনওয়েলথ মিনিস্টেরিয়াল ওয়ার্কিং গ্রুপ, ইউএন ও আফ্রিকান কমিশন ফর হিউম্যান এবং পিপল'স রাইটসসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কৌশলগত সম্পৃক্ততা স্থাপন করে। চলমান কৌশলগত উদ্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে, কমনওয়েলথ সংস্কারের জন্য অ্যাডভোকেসি এবং মনিটরিং; ইউএন হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এর আওতায় কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে সম্পৃক্ত হওয়া; মানবাধিকার কর্মী ও সুশীল সমাজের সুরক্ষার জন্য অ্যাডভোকেসি; এবং কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহে বিদ্যমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মনিটর করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভোকেসি করা।

এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের পুলিশ ব্যবস্থায় নারীদের পরিস্থিতি বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয়েছে। একই সাথে এতে বাংলাদেশ পুলিশ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এবং জেন্ডার প্রেক্ষিতে বৈচিত্র্যের অভাব সনাক্ত করা হয়েছে এবং এর জন্য কিছু প্রতিকারমূলক সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন পুলিশ ব্যবস্থায় উপযোগিতার ভিত্তিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে সমর্থন করে, কারণ আজকের পুলিশ ব্যবস্থার অধিকাংশ কার্য নারী-পুরুষ উভয়েই সম্পাদন করতে পারে। পুলিশের কাজ শুধুমাত্র পুরুষদের কাজ, প্রচলিত এই ধারণার সমর্থনে প্রায় কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি এই প্রতিবেদনের অন্যতম মূল বক্তব্যের একটি। জরিপের ফলাফল, নারীদের অভিজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা, এবং সুপারিশ সম্বলিত এই প্রতিবেদনটি পুলিশ বিভাগের অভ্যন্তরে জেন্ডার ভারসাম্য উন্নয়ন বিষয়ক চলমান সংলাপে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ পুলিশ এবং সুশীল সমাজের জন্য উপযোগী হবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবেশিত তথ্যের সকল দায়িত্ব সিএইচআরআই এর।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিসিয়েটিভস
৫৫ এ, চতুর্থ তলা, সিদ্ধার্থ চেম্বার-১
কালু সরাই, নতুন দিল্লী ১১০ ০১৬
ভারত
ফোনঃ +৯১ ১১ ৪৩১৮ ০২০০
ফ্যাক্সঃ +৯১ ১১ ২৬৮৬ ৪৬৮৮
এ-মেইলঃ info@humanrightsinitiative.org